হেসে গড়িয়ে পড়ার আগে পাঁচ টাকা ছাড়ুন

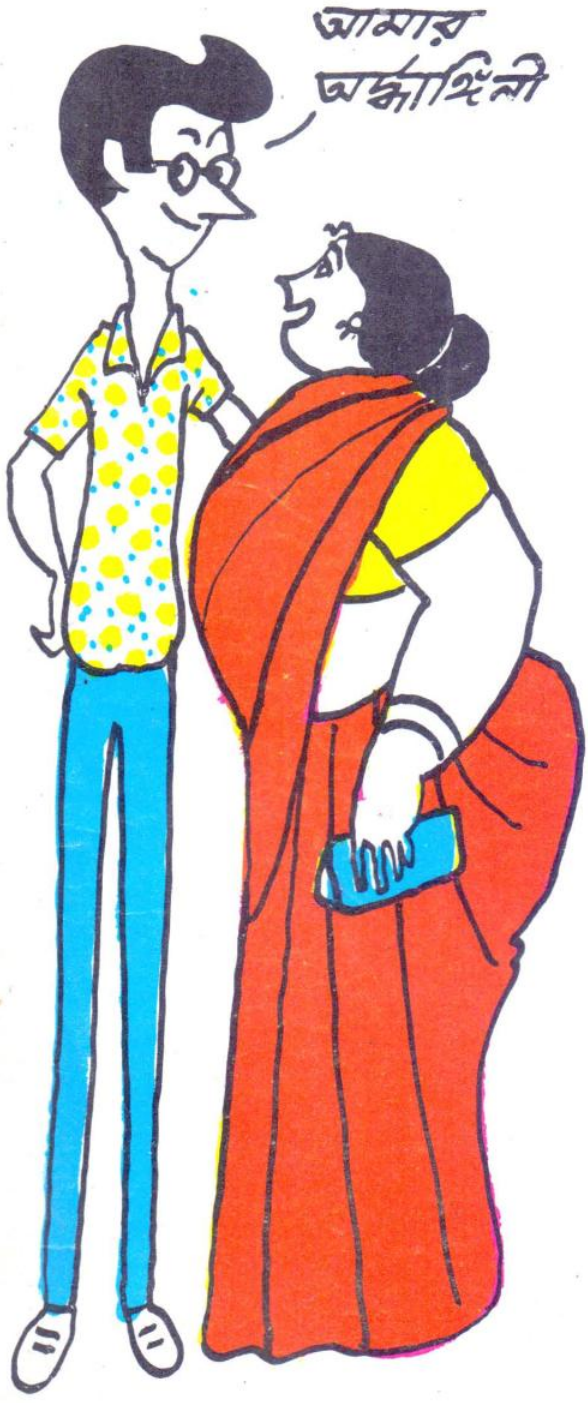

সুকুমার

মে
১৯৯৩

৪১

সরস কার্টুন

সরস কার্টুন

সরস কার্টুন

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

এসো পড়ি

ক খ

ক তে কাদের	**খ**তে খাওয়া	**গ** তে গরু	**ঘ** তে ঘাম
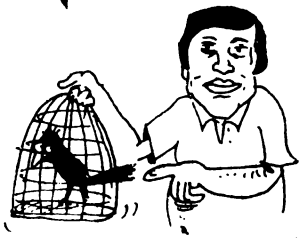		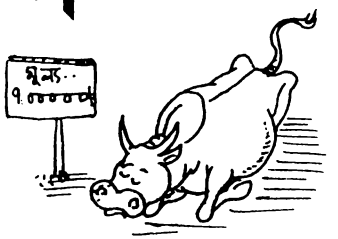	
কাদের বলে কাউয়া ভাই	নাওয়া ছাড়া খাওয়া নাই	ঈদ বাজারে গরুর দাম	মিয়া ভায়ের শইলে ঘাম
ঙ ঙ তে ভাই ছন্দ নাই	**চ** তে চান্দিছিলা	**ছ** তে ছাতি	**জ** তে জনগণ
চলেন এবার চ য়ে যাই	চান্দিছিলা চান্দু ভাই	ছাতি আছে ডান্ডা নাই	জনগণের ধারণা ভাই

বারো থেকে বিরানব্বুই সকলের জন্যে হাসির একমাত্র মাসিক পত্রিকা

সরস কার্টুন

এই অসাধারণ পত্রিকার কোনও বিকল্প নেই।
কেন্দ্র, রাজ্য ও সংসারের বাজেটের যাঁতাকলের মাঝে আপনার একমাত্র রিলিফ

৪১

চতুর্থ বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা
মে ১৯৯৩

ঘোষণা

পাঠকদের এবার একটা দারুণ খুশীর খবর দিচ্ছি। 'সরস কার্টুন'এর চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমরা জানুয়ারী '৯৩ থেকে দাম বাড়াবার বদলে দাম কমাচ্ছি। জানুয়ারী '৯৩ সংখ্যা বা তার পরে থেকে যাঁরা বার্ষিক গ্রাহক হবেন তাঁরা পূজা সংখ্যা সমেত বছরের সমস্ত সংখ্যা ৮৫ টাকার পরিবর্তে মাত্র ৭০ টাকায় পাবেন। ডাক খরচ আমরাই বহন করব।

নতুন বছরে "সরস কার্টুন"কে এগিয়ে নিয়ে যেতে এখনই আপনার বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে পাঠান। টাকা পেলেই প্রথম সংখ্যাটির সাথে আপনার গ্রাহক-কার্ড পাঠানো হবে। ঘরে বসে প্রতি মাসে পত্রিকা পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই ভাল।

— সম্পাদক "সরস কার্টুন"

সরস কার্টুন

সম্পাদক সুকুমার রায় চৌধুরী

কার্যালয় ঃ ৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ ফোন ঃ ৪২-৫৭৪৪

সহজ ইংরাজী শিক্ষা

সুকুমার

হাসির গল্প ঃ
ব্ল্যাকমেল ঃ শ্যামল দত্তচৌধুরী ৮
নাম নাম কেবলম্ ঃ গোরাচাঁদ চক্রবর্তী ২২
বিজ্ঞাপন ঃ অমিত রায় ২৪

ফিচার ঃ
রামগরুড়ের বৈঠক ৫
আড়চোখে ঃ লক্ষ্মীট্যারা ৬
পত্রাঘাত ঃ শ্রীরসময় সর্বজ্ঞ ২০

ছড়া ঃ ১৬ - ১৭
লিখেছেন ঃ কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগম্বর দাশগুপ্ত, শেখর চ্যাটার্জী, মধুসূদন পাল, বাসুদেব ঘোষ ও সঞ্জয় কর্মকার।

হাসিটুন ঃ সমর মাজী ৩২

সূচিপত্র

পূর্ণপৃষ্ঠা কার্টুন ফিচার ঃ
অমল চক্রবর্তী ১৮
সোমনাথ চ্যাটার্জী ১৫
রজত সরকার ৩০

এছাড়া এবার কার্টুন এঁকেছেন ঃ
অলোক দাশগুপ্ত, শুভজিৎ সিন্‌হা, পি জি, ভারতী, সুকুমার, কাজী, সোমনাথ চ্যাটার্জী, শৈল চক্রবর্তী প্রমথ সমাদ্দার ও অমল চক্রবর্তী

অলংকরণ ঃ
সুকুমার রায় চৌধুরী ও শুভজিৎ সিন্‌হা

প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ সুকুমার রায় চৌধুরী

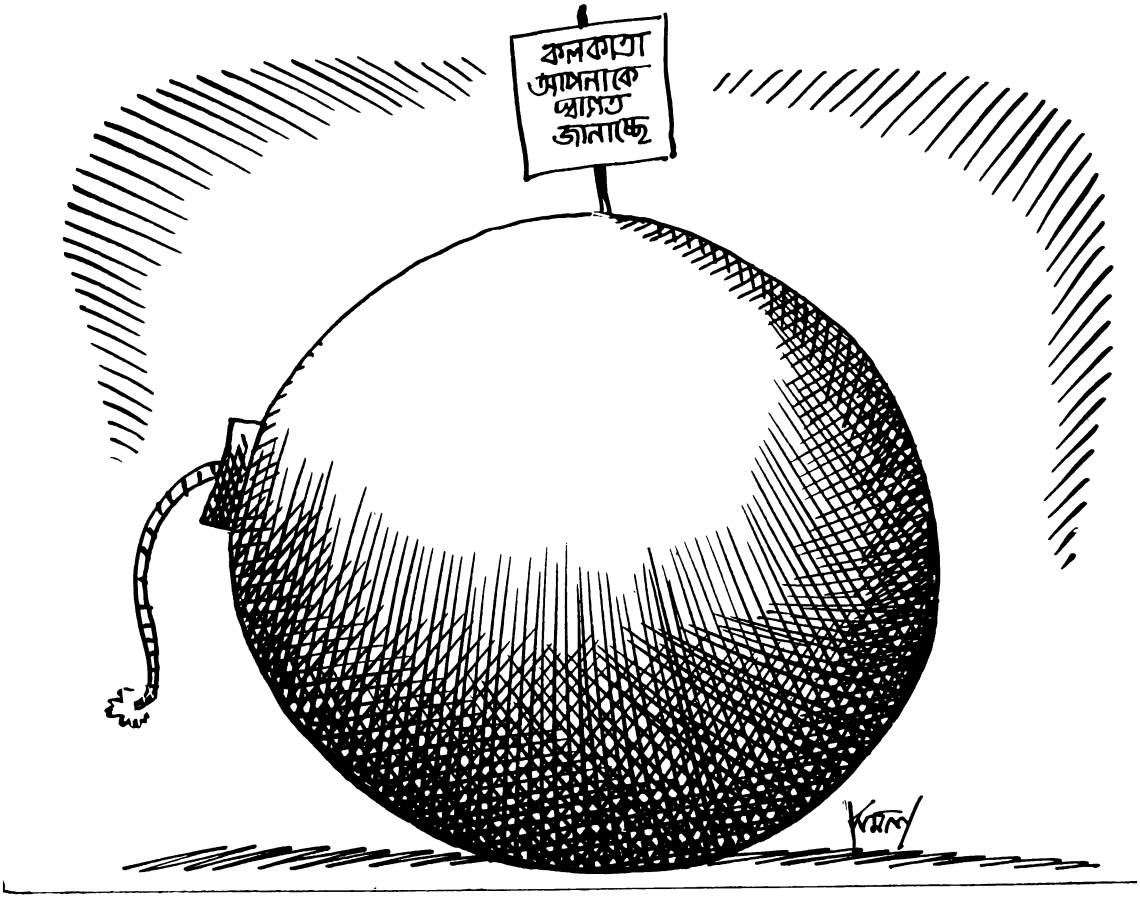

নিয়ম কানুন জেনে রাখুন

● যে মাসের সংখ্যা তা আগের মাসের শেষেই বেরিয়ে যায়।

● প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা। বার্ষিক সডাক গ্রাহক মূল্য ঃ পূজা সংখ্যা সহ পঁচাশি টাকা (১১টি সংখ্যা, কারণ পূজা সংখ্যাটি অক্টোবর-নভেম্বর যুগ্ম বিশাল সংখ্যা)।

তবে আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে পত্রিকার চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমরা বার্ষিক গ্রাহকদের জানুয়ারী '৯৩ থেকে ১৫ টাকা কমে মাত্র ৭০ টাকায় পূজা সংখ্যা সহ গ্রাহক করছি।

ঘরে বসে প্রতিমাসে বুক পোস্টে পত্রিকা পেতে হলে পুরো নাম, পিন কোড সহ ঠিকানা এবং কোন্ সংখ্যা থেকে পত্রিকা চান তা কুপনে লিখে আজই ৭০ টাকা মানি অর্ডারে আমাদের কার্যালয়ে পাঠান। টাকা পেলেই আপনাকে গ্রাহক করে নেওয়া হবে ও প্রথম সংখ্যাটির সাথে আপনার গ্রাহক কার্ড পাঠানো হবে।

এক বছরের কমে গ্রাহক করা হয় না।

ডাক বিভাগের গাফিলতিতে কোনও সংখ্যা না পেলে উর্দ্ধতন এবং স্থানীয় ডাক কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করবেন। ডাক বিভাগের দোষের জন্য আমাদের পক্ষে অগণিত গ্রাহকদের বার বার পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়।

● হাসির লেখা পরিষ্কার করে কাগজের একদিকে লিখে পাঠাতে পারেন। লেখা ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনোনীত হলে যে কোনও সংখ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে ছাপা হবে এবং সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো হবে। সঙ্গে পোস্টকার্ড, ডাকটিকিট বা খাম দেবেন না, কারণ লেখা মনোনীত হলো কিনা বা হলে কোন্ সংখ্যায় ছাপা হবে তা ব্যক্তিগতভাবে জানানো সম্ভব নয়। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না। কাজেই লেখার কপি রেখে পাঠাবেন।

● কার্টুন ভাল কাগজে চাইনিজ ইঙ্কে এঁকে পাঠাতে পারেন। মাপ চওড়ায় ৩ বা ৬ ইঞ্চি, উচ্চতা আনুপাতিক। পেন্সিল, লেখার কালি, বলপেন বা স্কেচপেনে আঁকা কার্টুন ভাল হলেও ছাপা যাবে না। কার্টুন ভাল হলে যে কোনও সংখ্যায় ছাপা হবে বিনা পারিশ্রমিকে এবং সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো হবে। অমনোনীত কার্টুন ফেরত দেওয়া যাবে না বা ব্যক্তিগতভাবে মতামত জানানোও সম্ভব নয়।

● স্থানীয় বিক্রেতারা আমাদের ডিস্ট্রিবিউটার 'ওমপ্রকাশ নিউজ এজেন্সি' ৮/২ এসপ্লানেড ইস্ট, কলকাতা—৭০০ ০৬৯ (ফোন ২৮-৫৬২৪) থেকে পত্রিকা নিতে পারেন। বাইরের এজেন্টরা সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এজেন্সির জন্য লিখুন। ২০ টাকা জমা পাঠিয়ে ১০ বা তার বেশী কপির অর্ডার দিলে ২৫% কমিশনে ভি·পি-তে বই পাঠানো হবে। ভি·পি খরচ আমরাই বহন করব।

৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩১

ফোন ঃ ৪২-৫৭৪৪

রামগরুড়ের বৈঠক

এক শতাব্দী পার হইয়া ১৪০০ সাল আসিয়া গেল। শতাব্দীবৃদ্ধ রামগরুড় বসিয়া ভাবিতেছে, শতবর্ষের মধ্যে ৪৬ বৎসর আমরা স্বাধীনভাবে কাটাইলাম। কিন্তু কি ভাবে?

আমরা টেলিফোন, ডাক ও তার, বিদ্যুৎ, কর্পোরেশন ইত্যাদিকে একচেটিয়া সরকারী পরিচালনায় রাখিলাম। ফলে টেলিফোন খারাপ হইলে অন্য কাহারো কাছে যাইবার উপায় নাই। অতএব উৎকোচ না দিলে সে টেলিফোন আর চালু হইবে না। মন্ত্রীকে লিখিয়া লাভ নাই। তিনি গদি বাঁচাইতে হিমসিম খাইতেছেন। তুচ্ছ এক নাগরিকের তুচ্ছ টেলিফোন লইয়া মাথা ঘামাইবার তাঁর সময় কোথায়? কিন্তু ইহা যদি গুটি ৩/৪ প্রাইভেট কোম্পানীর হাতে থাকিত তবে গ্রাহক ও রোজগার হারাইবার ভয়ে তাহারা ফোন খারাপ হইলেই দৌড়াইয়া আসিত।

ব্যাঙের ছাতার মত ক্যুরিয়ার সার্ভিস গজাইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে দেখিয়াও ডাক ও তার বিভাগের চৈতন্য নাই। আপনার 'সরস কার্টুন"-এর কপি আপনার কাছে না পৌঁছাইয়া দিলেও তাঁহারা মাস গেলে পুরা বেতন পাইয়া যাইবেন। সরকারের রোজগার কমিল কি বাড়িল তাহাতে তাঁহাদের মাথা ব্যথা থাকিবার কথা নহে।

এমনি অন্য সব সরকারী বিভাগেও। মন্ত্রী হইবার জন্য মরনপণ সংগ্রাম ও সেই গদি বজায় রাখিবার ও দুইহাতে পয়সা কামাইবার নিরলস কর্মব্যস্ততায় তাঁহাদের জনগণের কথা ভাবিবার সময় নাই। শুধু জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে জানিলেই জনগণকে বোকা বানাইয়া ভোট পাওয়া যায়। অতএব মা ভৈঃ।

অর্বাচীন "সরস কার্টুন" সম্পাদকের মূঢ়তায় রামগরুড় যার পর নাই বিস্মিত। রাস্তার গর্তে ও মধ্যযুগীয় বাষ্পে বাসের মধ্যে মাথা ঠুকিয়া যাওয়া যাত্রী যখন আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে, তিনি তখন একখানি "সরস কার্টুন" বাড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "একটুখানি হাসুন তো"! বাজারে গিয়া, ট্রেনে বাসে সর্বত্র অগ্নিমূল্যে জেরবার জনগণকে তিনি বলিতেছেন, "একটুখানি হাসুন তো"!

হে ১৪০০ সাল, হে নতুন শতাব্দী, তোমার কাছে রামগরুড়ের একান্ত প্রার্থনা, এই স্বাধীন দেশের স্বাধীন নেতাদের, মন্ত্রীদের, সরকারকে আরওশক্তিমান কর। বাকী সব বিভাগকে একচেটিয়া সরকারী মালিকানাধীনে আনিয়া দাও। যাহাতে কোটি কোটি দেশবাসী রামগরুড়ের ছানায় পরিণত হইয়া এই আসরে ভিড় করে। "সরস কার্টুন" সম্পাদকের কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা দিবার এই অপচেষ্টা চিরতরে নিপাত যাক।

আড় চোখে

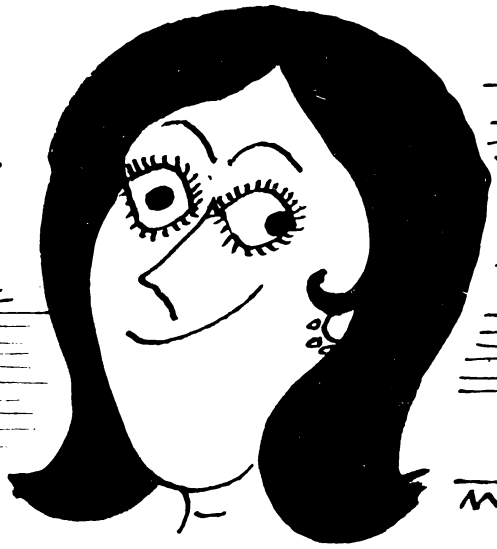

লক্ষ্মীতারা

বৌবাজার বিস্ফোরণের ইস্যুতে কংগ্রেস বাংলা বন্‌ধ ডাকার প্রস্তাব করেছে।—সংবাদ।

● এর প্রতিবাদে আর একটা বামফ্রন্টের বন্‌ধ, তাতে পুলিশিঅত্যাচারের প্রতিবাদে আবার কংগ্রেসের বন্‌ধ, বন্‌ধের বিরুদ্ধে বিজেপির বন্‌ধ—এইভাবে এরা চালিয়ে গেলে জনসাধারণ কয়েকদিন ছুটি পেতে পারে। উপরি পাওনা, সব দলের অভিনন্দন।

জব্বলপুর হাইকোর্ট মধ্যপ্রদেশ বি জে পি সরকারকে বরখাস্ত করা ও রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করাকে বেআইনী ঘোষণা করেছেন।

● রাজ্যপাল ও জজ দুটোই যখন কেন্দ্র নিয়োগ করেন, তখন রাজ্যপালের মত জজদেরও কেন্দ্রের হুকুম মানতে বাধ্য করা হোক।

জব্বলপুর হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রীম কোর্টে যাবেন বলে স্থির করেছেন।—সংবাদ।

● অত ঝামেলার দরকার কি? হাইকোর্টের রায় না মানলেই হ'লো! এই তো কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়াল-লিখন মুছে দেবার আদেশ কোনও পার্টিই মানেননি। তাতে তাদের কি কোনও শাস্তি হয়েছে?

সুবাস ঘিসিং আবার গোর্খাল্যান্ড দাবী করেছেন।—সংবাদ।

● সেটা বোধ হয় সি পি এমের ত্রিপুরা পাওয়া দেখেই!

ত্রিপুরায় সি পি এমের জয়কে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সি পি এমকে উপহার বলেছেন মমতা ব্যানার্জী।

● বড় কাজ উদ্ধার করতে ছোটখাটো ভেট দেওয়ার প্রথা সারা দুনিয়ায় চলছে!

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার জানিয়েছেন যে হাওড়া ও শিয়ালদায় মাইক্রো প্রসেস্‌ড টিকিটের মেশিন বসানো হবে। এতে জাল টিকিটের সম্ভাবনা দূর হবে।

● কিন্তু সুপার মাইক্রো প্রসেস্‌ড মসৃণ যে সব হাতে গেটেপয়সা দিয়ে বিনা টিকিটের যাত্রীরা পার হয়ে যান, সেটা কোন্ মেশিন বসিয়ে দূর হবে তা তো বলেন নি জি. এম.!

দলের কেউ সমাজ-বিরোধী কাজ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেছেন শৈলেন দাশগুপ্ত।

● কিন্তু সমাজ-বিরোধীদের দিয়ে করালে?

দুই বন্ধুর কথোপকথন ঃ

১ম ঃ নরসিমা রাও, জ্যোতিবাবু যা চাইছেন তাই দিয়ে দিচ্ছেন।

২য় ঃ যদি প্রধানমন্ত্রী হতে চান ?

১ম ঃ না না, ওটা দেওয়া যাবে না। ওটা রাখার জন্যেই তো এত দেওয়া-থোয়া !

বাবরি মসজিদ হিন্দুমন্দির ছিল কিনা তা জানতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন রাষ্ট্রপতি।—সংবাদ।

● এর পর সরকার পরিচালনাটাও সুপ্রিম কোর্টের হাতে তুলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী পেতে সব দল মরিয়া হয়ে মহিলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।—সংবাদ।

● এ তো বড় জ্বালা হ'লো মশাই ! গুণ্ডা ও পুলিশের ধর্ষণের হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করাই দায় হয়ে উঠেছে এ রাজ্যে। তার পরও যদি কংগ্রেস, বি জে পি, সি পি এমের তিন অকৃতদার নেতা সোমেন মিত্র, তপন শিকদার আর বিমান বসু মহিলা ধরতে বেরিয়ে পড়েন তবে তো বিপদের কথা !

রাজ্য সরকার ১লা এপ্রিল থেকে জলের মাশুল বাড়ালেন। —সংবাদ।

● ঠিকই করেছেন। মরা প্যাঁচা ও আন্ত্রিক বীজাণুযুক্ত এই স্পেশাল জল তো আর যেখানে সেখানে মেলে না !

কেন্দ্রীয় সরকারের টেক্‌নোলজি টেলিকম কমিশনের পরামর্শদাতা এস. এস. প্রসাদ বলেছেন, অষ্টম যোজনায় সারা দেশে ৯ লক্ষ নতুন টেলিফোন দেওয়া হবে।

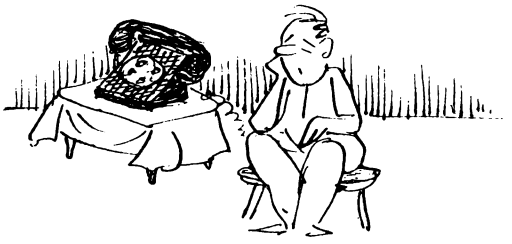

● এর জন্য কোনও প্রসাদের দরকার নেই। ইতিমধ্যেই কলকাতায় হাজার হাজার গ্রাহকের বাড়িতে স্টোরে পড়ে থাকা টেলিফোন বসিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করা হচ্ছে বিনা আয়াসে। কারণ ওগুলো বাজাতে হয় না।

আগামী বছর থেকে কলকাতায় 'ফটো ফোন' চালু হবে। —সংবাদ।

● যে সব রোমিওরা সুদর্শন নন তাঁদের জন্য এখনকার ফোন চালু থাকবে তো ?

ব্ল্যাকমেল

শ্যামল দত্তচৌধুরী

হাজরা মোড়ে হঠাৎ দেখা হতেই অলক বললে, 'চিড়িয়াখানায় যাচ্ছি। যাবি?'

আমি বললাম, 'চি—'

'আচ্ছা অমিতাভ, বেশ চিন্তা করে বল দেখি হনুমান সম্বন্ধে তোর মতামত কি?'

'হনু—'

'মনে কর, তুই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিস, একজন হাসিখুশী লোক এসে তোর কাঁধে টোকা মেরে বললে, 'আচ্ছা হনুমান সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে পারি? তুই তখন কি বলবি? কিম্বা ধর, কোন চাকরীর ইন্টারভিউতে তোকে হনুমান বিষয়ে দশ মিনিট বলতে বলা হল। তখন?'

'হনু—'

'আমাকে যদি কেউ কোনদিন এই প্রশ্ন করে, আমি শুধু অল্প একটু হাসব। এই রকম। একটা সিগারেট ধরিয়ে—এইভাবে—তাকে একটা গল্প বলব।'

'গ—'

'আচ্ছা, আচ্ছা আমি বলছি গল্পটা, একটু শান্ত হয়ে পার্কে গিয়ে বোস্। চল। কি বললি? এনশেন্ট মেরিনার? সে আবার কে? কোন দুষ্প্রাপ্য হনুমান? তুই বড় বাজে বকিস্ অমিতাভ। শোন, তখন আমি বেড়াতে গেছি সিমলায়।

কলকাতা থেকে ১০৩ খানা টানেল পার হয়ে সোলানের মাতাল নিঃশ্বাস নিয়ে, সিমলা স্টেশন থেকে বৃষ্টির মধ্যে

হাঁটতে হাঁটতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে জুকু মন্দিরের ঠিক নীচে যে হোটেলটা আছে সেটায় গিয়ে যখন পৌছোলাম তখন শক্তি নিঃশেষ—নইলে তক্ষুণি ফিরে এসে পরের ট্রেন ধরতাম। ঘরে কোন মতে মালপত্র রেখে ম্যানেজারের ঘরে আগুনে পা সেঁকতে বসলাম। ঘন্টাখানেক পরে গরম হয়ে ঘরে ফিরে দেখি সমস্ত লন্ডভন্ড। আমার জামা-টামা সব চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

প্রথমে ভেবেছিলাম তুচ্ছ চুরির ব্যাপার, আর এই শীত অগ্রাহ্য করে চোরটা মিছিমিছি আমার বাকসো ঘেঁটে হতাশ হয়েছে ভেবে একটু লজ্জাই হয়েছিল, কিন্তু তারপরেই কেমন একটা ক্যাঁচ ম্যাঁচ শব্দ শুনে দেখলাম জানলার উপরে একটা হনুমান বসে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে।.... আমার দিকে। লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেলাম। আমার বাকসে তবুও চোরকে খুশী করার জন্যে হয়তো দু'চারটে আন্ডারওয়ার পাওয়া যেতো, কিন্তু সত্যিই হনুমানটার পণ্ডশ্রম হয়েছে। ও নিশ্চয় মনের মত কিছু খুঁজে পায়নি। ওর রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে। ম্যানেজার আমাকে যে আপেল দিয়েছিল তাই একটা বের করে দিলাম পকেট থেকে। ও সেটাকে পলকে শেষ করে আবার হাত বাড়ালো। তখন অন্য আপেলটাও দিতে হল। হনুমান তার পরে তৃপ্ত মুখে লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু পরে বেরোলাম ঘর থেকে। করিডোরে দেখা হল একজন পিতা আর তার মেয়ের সঙ্গে। হনুমান সম্বন্ধে তাদের মতামত জানার আগেই তারা গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল।

সত্যি বলতে কি, কোন হনুমানের সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ। এর আগে হনুমান দেখেছি অনেক, তারা টারজানের মত গাছে গাছে লাফায়, খাঁচার ভিতরে দোল খায়, কিম্বা ভাবুক পথিকের হাত থেকে কলা কেড়ে নেয়। আমি তাদের দূর থেকে দেখেছি, শ্রদ্ধা করেছি, কিন্তু এর আগে কোনদিনও কারো সঙ্গে পরিচয় হয়নি। হনুমানদের চেহারা বেশ জ্ঞানী দার্শনিকের ধরনের। সময় পেলাম না, নইলে ওর কাছে ডারউইন সম্বন্ধে ওর মতামত জানতে চাইতাম।

রিজে দৌলত সিং পার্কের বেঞ্চে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলে ভীষণ রামায়ণের কথা মনে পড়ে। ঐ উপন্যাসটায়—যে কোন সতর্ক পাঠকের কাছেই ধরা পড়বে—হনুমানদের উপরে গ্রন্থকারের একটা অস্বাভাবিক টান দেখা যায়, পাতায় পাতায় শুধু হনুমানের কথা, সুগ্রীব-বালী-নল-নীল-গবয়-গবাক্ষ সত্যি বলতে কি, একেক সময় সন্দেহ হয় এই অ্যাডভেঞ্চার বইটার আসল হিরো কে! হিরোসুলভ, গুণও রামের চেয়ে হনুমানের অনেক বেশী।

এই সমস্ত ভাবছি আর দেশে ফিরে একটা প্রবন্ধ লিখব বলে নোট করছি, এমন সময় আমার পাশে এসে বসল হোটেলে দেখা সেই পিতা আর তার মেয়ে। মেয়েটি মুখে যদিও অনেক রং-টং মেখেছে তবু বোঝা যায় খুবই সুন্দর দেখতে। তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কোবিম্বাধরোষ্টি। ডিডিং

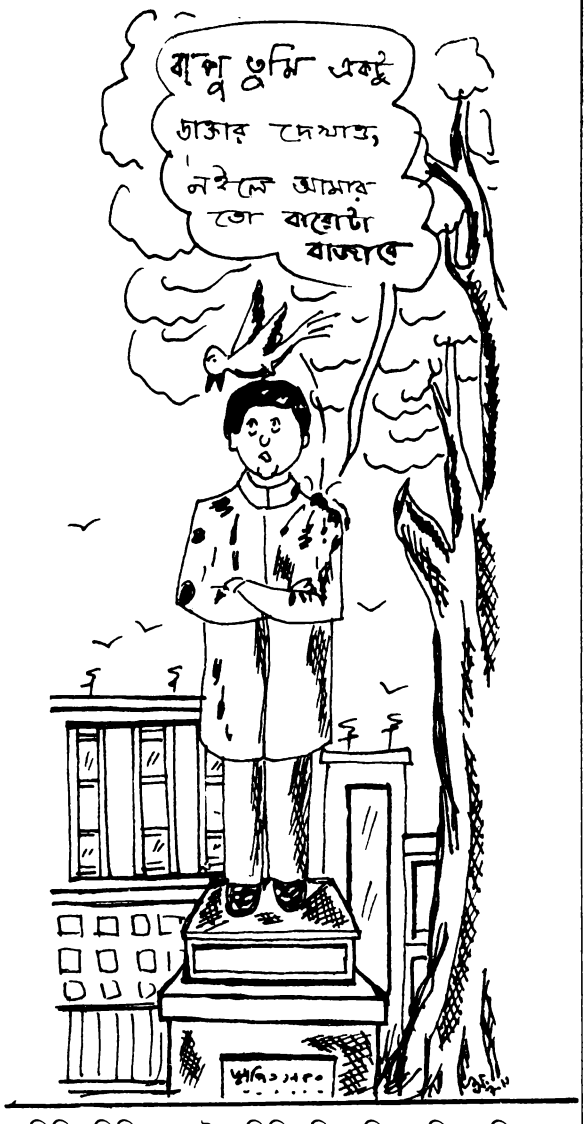

ডিডিং ডিডিং নমস্তস্যৈ ডিডিং নিম্ননাভিঃ।। কি বললি।··· না না, শেষটা নাও হতে পারে, লম্বা ওভারকোট, তবু ওর শরীরের যেটুকু আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তাতে আমি বাজী ধরতে পারি, কালিদাস একটুও হতাশ হতেন না। সব মিলে যেত হুবহু।

পিতার হাতে দেখা গেল একটা ক্যামেরা। তবে দেশলাই নেই। আমি ওর সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। তখন তিনিই যেচে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। ওর ঘন ঝোপের মত ভ্রূর গহ্বরে ছোট ছোট চোখ দেখে ভেবেছিলাম হিংস্র স্বভাবের হবে—আমাদের সেই প্রফেসর চক্রবর্তীর মত যিনি রেগে গেলেই ব্ল্যাক বোর্ডে মাথা ঠুকতেন—কিন্তু একটু পরেই

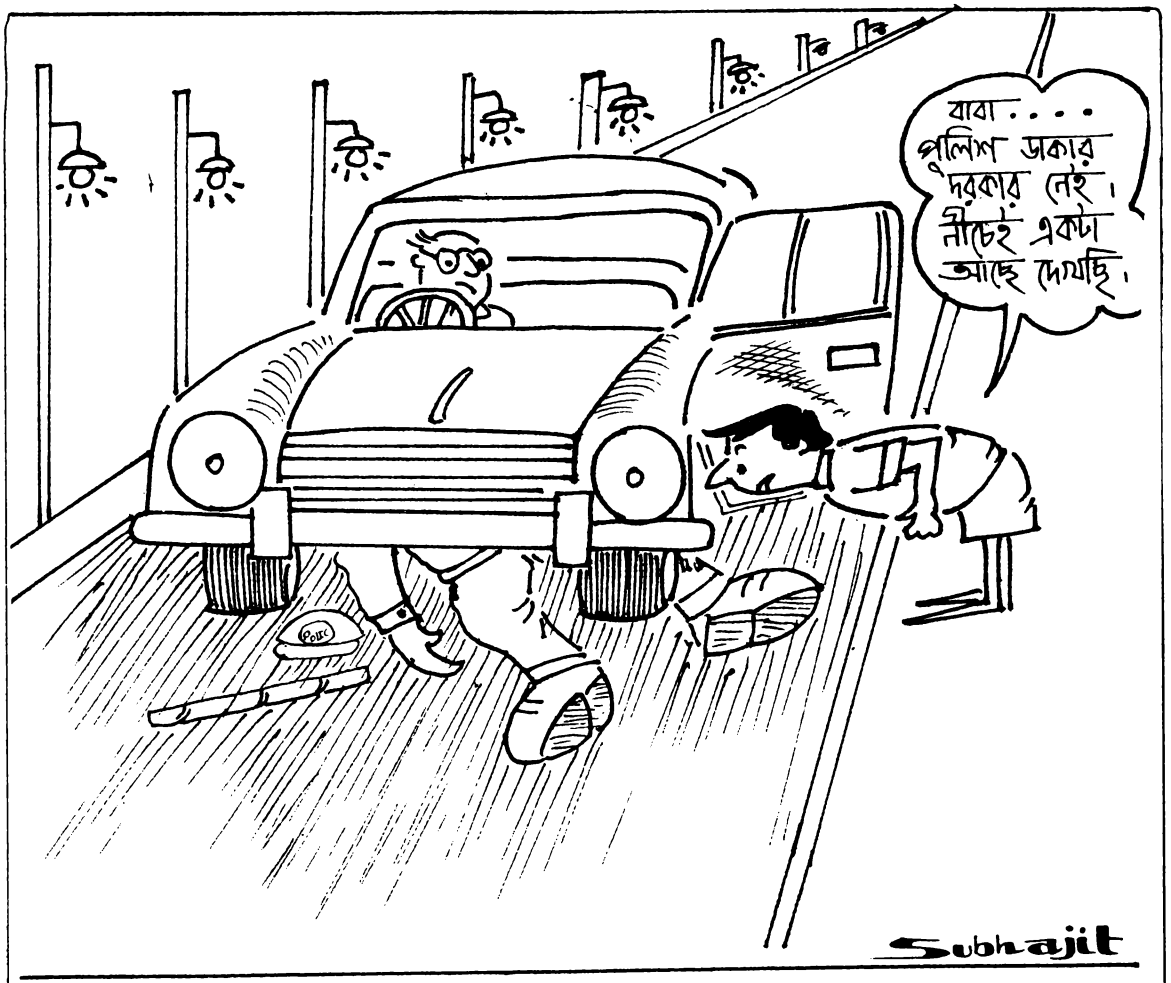

বুঝলাম ইনি সে রকম নন, বেশ বন্ধু-ভাবাপন্ন আর মোটেই ডাস্টার ছুঁড়ে মারার উপরে কোন ঝোঁক নেই। ওর নাম সতীশ ভাম্বানি—মহারাষ্ট্রের লোক। অনেক গল্প টল্প করে আমার বাড়ির কথাও জেনে নিলেন। আমিও সরল মনে বললাম যে আমি আমার মামার বাড়িতে থাকি, আর নিঃসন্তান মামা মরে গেলে সব সম্পত্তি আমি পাবো। তবে মামা মরতে চাইছেন না, চাকরের সর্দি হলেই নিজে টনিক খেতে থাকেন। একটা পয়সাও হাতখরচ দেয় না আমাকে। ভদ্রলোক অনেক সমবেদনা জানালেন, তারপর আমি হনুমান সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম।

তিনি হনুমানদের একদম পছন্দ করেন না বললেন। একবার—তখনো তাঁর বিয়ে হয়নি—তিনি আর তাঁর দাদা, দু'জনেই ব্যাচেলার, বেনারসে চাকরী করতেন। এক ঘরে থাকতেন। একদিন তাঁদের ঘরে মেয়েদের লিপস্টিক আবিষ্কৃত হল। দু'জনেই স্বভাবতই দু'জনকে সন্দেহ করতে লাগলেন। ঠাণ্ডা যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হয়ে উঠল। তার দিন সাতের পরেই আবার আরেকটা পাওয়া গেল বিছানার নীচে। দু'জনে প্রায় হাতাহাতি। তাঁরা আলাদা হয়ে গেলেন, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। শেষে জানা গেল পাশের বাড়ির এ-শটি মেয়ের সম্পত্তি সে সব, একটা হনুমান চুরি করে তাদের ঘরে লুকিয়ে রাখতো।

আহা, আমি বললাম সতীশ ভাম্বানিকে, পরে নিশ্চয় জীবনে আপনারা এমন লিপস্টিক ঘরে পেয়েছিলেন যা হনুমানে দিয়ে যায়নি।

এই সময়ে তিনি অপাঙ্গে মেয়ের দিকে তাকিয়ে এক মিনিট আসছি, বলে গাছের আড়ালে চলে গেলেন।

মেয়েটি বেশ ফরোয়ার্ড ধরনের। সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশে গা ঘেঁষে বসল এবং বক্র হেসে আমাকে সবলে চুম্বন করল।

'ক্লিক' করে শব্দ হতে দেখলাম ভদ্রলোক ক্যামেরাটা বাকসে ভরে ফেলছেন। মেয়েটি আমার কাছে এক হাজার টাকা চাইলো সেই ছবির বদলে, তারপর বাবার হাত থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে গেল।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকার পরে ভদ্রলোককে সত্যি কথাই বললাম। খুলে বললাম যে আমার কাছে রিটার্ণ টিকিট ছাড়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বলতে আর কিছুই নেই। ভদ্রলোককে আমার পাশে বসিয়ে সিগারেট খাইয়ে আমি প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। এই বিদেশে আগন্তুক আমি, কোথা থেকে পাবো এক হাজার টাকা? পাঁচ টাকায় হবে? ছয়? হবে না? এ যে নিষ্ঠুরতা। আপনি কি চান সবাই আঙুল দেখিয়ে আপনাকে নিষ্ঠুর বলে গালি দিক? আপনি যে একেবারে প্রঃ চক্রবর্তীর মত ব্যবহার করছেন? ছিঃ ছিঃ মিঃ সতীশ ভাম্বানি, আমার যে অনেক আশা ছিল আপনার ওপর। একজন অসহায়, নিরুপায়, নিরাশ্রয় স্বদেশবাসীকে···উঃ আমি আর ভাবছে পারছি না। সাড়ে ছয়ে হবে? সা-আ-আ-ত? হায় তাত, উচিত কি তব এ কাজে!

লোকটা তবু অটল। সব শুনেটুনে বোধহয় ওর দুঃখ হয়েছিল, বললে—এ আমার হাতের বাইরে। দায়িত্ব আমার একার হলে আমি আপনার সঙ্গে টাকা দশেকের মধ্যে রফা করে ফেলতাম। কিন্তু মেয়েকে সামলাবে কে? মেয়েকে তো চেনেন না—এই সময়ে তিনি কেঁপে উঠলেন, বললেন—আপনাকে সতি কথাই বলি, ও আমার আপন মেয়ে নয়, আমি ওর বিজনেস্ ম্যানেজার কাম ক্যামেরাম্যান। বোম্বাইতে একজন আপনার মতই বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের এক হাজার টাকা প্রণামী দিয়েছিল, সেই টাকায় হাওয়াবদল করতে এসেছি সিমলায়। কিন্তু, কি বলব আপনাকে, আপনাকে বন্ধু ভাবি বলেই বলছি, কয়দিনের মধ্যেই মেয়েটা কেনাকাটা করে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমাদেরই বোম্বেতে ফেরার টাকা নেই। নইলে বিশ্বাস করুন আমি কোনদিন হাওয়াবদল করতে এসে ব্যবসার চিন্তা করি না। তা ও বললে একটু আগে, ঐ যে পার্কে একজন গাধা, আই মীন মানুষ বসে আছে, ওই আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করে দেবে। তারপর কি হল তাতো আপনিই ভাল জানেন, এখন আমি কি করব বলুন?

তুই বল্ অমিতাভ, এই করুণ কাহিনীর পরে আমি কিই বা সান্ত্বনা দিতে পারি? বললাম—সত্যি দুর্ভাগ্য, আজকালকার মেয়েরা এই রকম অদূরদর্শী হয়, আমি শুনেছি। কলকাতায় আমার এক বন্ধুর কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে। ওকে দেখলে এখন আপনি চিনতে পারবেন না এমন চেহারা হয়েছে ওর। কাক-তাড়ুয়ার মত দেখায় ওকে, এত রোগা যে প্যাশ ফিরে দাঁড়ালে ছায়া পড়ে না। কারণ খুঁজে দেখুন—বৌর অদূরদর্শিতা। আজ বলে, জামাইবাবু আসবে যাও ফ্লুরির পেস্ট্রি নিয়ে এস, কাল বিশুদা আসবে অনাদির কষা নিয়ে এসো, পরশু পিসীমারা আসবে মাকালীর প্রসাদ নিয়ে এসো। আর এতো ভালো ভালো খাওয়ালে ওরা তো ঘন ঘন

আসবেই! আমার বন্ধু প্রায় পথে বসেছে। যাইহোক আপনার কিন্তু ঐ মেয়েকে যারপরনাই কড়া শাসন করা উচিত। এই যে দেখলেন, আমি একজন অচেনা, অনাত্মীয়, আমার কাছে সে এক হাজার টাকা চেয়ে বসল, এটা কি ন্যায় কাজ হল? বলুন? ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, কেমন? আমি যাই তাহলে, হ্যাঁ? আপনার তো বলতে গেলে মেয়েই।

লোকটা একটু ভেবে বললে, আমার কথা একটাও শোনে না। ঐ ছবিটা ঠিক ও আপনার মামাকে পাঠিয়ে দেবে যদি না টাকা পায়। ছিলাম ইঞ্জিনীয়ার, আর শেষে কিনা—

—আপনি ইঞ্জিনীয়ার?

—কেন? আপত্তি আছে?

—আমিও ইঞ্জিনীয়ার।

—তাই নাকি? বাঃ। ভাম্বনি বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো,—থারমো-ডায়নামিক্সের সেকেণ্ড ল' মনে আছে?

—বলুন দেখি, ডিজেল ইঞ্জিনের এফিশিয়েন্সি?

—গীয়ারের প্রেশার অ্যাঙ্গেল কত হয়?

—ওপেন চ্যানেল ফ্লোয়ের—

—ক্যান্টিলিভারে ট্র্যাভেলিং লোড—

এমনি কিছুক্ষণ ভাম্বানি আর আমি আলোচনা করলাম। তারপর যখন দেখা গেল আমাদের প্রশ্নই বেশী, কেউ বড় একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করছে না তখন আমরা দুজন দুজনকে সস্নেহে দেখতে লাগলাম। দুই ইঞ্জিনীয়ারের সাক্ষাৎ এমনি মধুর এবং স্নিগ্ধ। কেউ কাউকে ঘাঁটায় না।

ভাম্বানির জীবন বেশ ঘটনাবহুল। ৬৭'র রিসেশনে যখন চাকরী গেল তখন কয়েক বছর রাস্তার কোণ থেকে ফিসফিস করে 'চাইনীজ পেন, চাইনীজ পেন,' তারপর চৌপাট্টিতে তরমুজ বিক্রি, সিনেমায় আপকো টেলিফোন বস; ধরনের ছোট কিন্তু প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অভিনয় করার পরে সে বান্দ্রার সমুদ্রতীরে মদ চোলাইয়ের ব্যবসা করছিল—সেই সূত্রেই এই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়। তার পরামর্শেই তারপর তারা এই ব্ল্যাকমেল করার ব্যবসায় নেমেছে। ভাম্বানি ছবি তোলে, আর কাজের অবসরে মেয়েটির নেশা হল হনুমানের ছবি তোলা। বোম্বের চিড়িয়াখানার সব হনুমানেরই নাকি বিভিন্ন পোজের ছবি আছে মেয়েটির অ্যালবামে।

শেষে ভাম্বানি যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়ের খোঁজে যাত্রা করল, আমিও এক হাজার টাকার চিন্তা করতে করতে হাঁটতে লাগলাম। রিজ ধরে নেমে সিঁড়ির ধাপে ধাপে চলে গেলাম লোয়ার বাজারে। ঘুরছি উদ্দেশ্যহীনভাবে, দোকানপাট দেখছি শূণ্য চোখে, কেবল ভাবনা টাকা পাবো কোথায়? কার কাছে ধার করা যায় এই দেশে? মামা যদি ঐ ছবি দেখে তাহলে আমাকে প্রথমে বেদম ঠ্যাঙাবে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে ত্যাজ্য ভাগ্নে করে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনে দান করে ফেলবে।

রাত ঘনাতে লাগল, কোন পথ খুঁজে পেলাম না। আবার অন্যমনস্ক হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। উপরে নীচে আলো জ্বলছে—কিন্তু সিঁড়িটা অন্ধকার। নির্জন। হঠাৎ

জব্দ-শব্দ

সমাধান

পাথরের দেয়ালের পাশ থেকে আরো কালো একটা ছায়া সচল হয়ে উঠল, বললে, হাত উঠাও উপ্‌রমে। চুপ রহো, অত্যধিক চিল্লানে সে এই চাকু তুমকো—ইয়ে, কি যেন বলে—সিনামে ঘুসায়গা। সমঝা? ধ্যাত্তেরি, এই ল্যাঙ্গুয়েজটা জ্বালিয়ে দিল মাইরি! তা, শুনো শেঠ, পাকিটমে জিতনা পয়সা হ্যায় নিকালো, নইলে—বলে সে ছুরিটা তুলে দেখালো।

আশ্চর্য ভারতবর্ষের অপরাধী গোষ্ঠী বারে বারেই একজন কপর্দকশূন্য পথচারীকে আক্রমণ করছে কেন! যাইহোক, এই সুদূর সিমলায় একজন বাঙালী চোর দেখে আমার বুক গর্বে ভরে উঠেছিলো। কোথায় আমাদের সোনার বাংলা আর কোথায় হিমাচল প্রদেশের এই পাহাড়ী স্টেশন। এতদিন শুনে এসেছি আমাদের বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা জয় করেছিল। আর আমরা 'হেলায় বাঘেরে খেলাই' আর 'নাগের মাথায় চড়ে নাচি' (খুব কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই), কিন্তু আমাদেরই একজন প্রতিভূ যে এই দূর দেশে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চারিদিকে দুঃসাহসিক চুরি করে বেড়াচ্ছে একথা সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমি অস্ফুটে গেয়ে উঠলাম, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, বাংলা? কালী মার্কা? এক নম্বর? কই দেখি!

আমি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে বললাম—নেই। আমার কাছে টাকাও নেই। টাকা থাকলে আপনাকে আমি সোনা দিয়ে মুড়ে দিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমারই টাকার বড় দরকার। তা কিছু টাকা ধার দিতে পারেন? এই ধরুন হাজারখানেক? পারেন না? আচ্ছা চারমিনার খান।

দুজনে তারপরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। আলোয় এসে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে বাক্যহারা হয়ে রইলাম। কে আর। অজিত। অজিতকে তোর মনে আছে অমিতাভ?

অজিতকে আমার খুব ভালই মনে আছে। স্কুলে দু ক্লাস উঁচুতে পড়তো, মাস্তান ধরনের, আমার টিফিন রোজ দশ পয়সায় কিনে নিতো। একদিন আমার টিফিন খেয়ে আমার রুমালে হাত মুছে বললে—এই অমিতাভ, কাল বিকেলে তোর বাড়িতে যাবো। অজিতকে আমরা খুব সম্মান করতাম। ওর কথা শুনে আমি দারুণ বিগলিত হয়ে মাকে গিয়ে বললাম, কাল আমার বন্ধু আসছে, যেন বেশ খাওয়ানো হয়। পরদিন অজিত বেশ খেয়েটেয়ে, 'স' কে ইংরিজি 'এস'-এর মত উচ্চারণে বললে—মাসীমার সঙ্গে এখন আমি গল্প করব, তুই বড়দের মধ্যে ঘুর ঘুর করছিস্ কেন? যা যা খেলতে যা। মাসীমা, মেসোমশাইকে দেখছি না? অফিস করছেন বুঝি? এরা কি যে সারাদিন অফিস-টফিস করে, বুঝি না। আমার বাবা বেশ মেজাজে আছে। মাকে ডিভোর্স করে দিয়ে একলা বাস করছেন, তারপর—তারপর মা অজিতকে কানে ধরে বের করে দিলেন।

তা অমিতাভ (অলক বলতে লাগল) এতদিন পরে অজিতকে দেখে ভীষণ আনন্দ হল। পুরোনো দিনের গল্প করতে করতে চা খেলাম। ও তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল। শেষে আমার দুর্দশা খুলে বলতেই অজিত সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করে দিল। ক্যামেরা থেকে ফিল্মটা চুরি করতে হবে।

আমি একটু ইতস্তত করলাম। ক্যামেরাটা ওরা নিশ্চয় নিজেদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। এখন চুরি ব্যাপারটায় আমার তেমন আপত্তি নেই। আমি জানি যে কবিতা লেখার মত চুরিও আর্টের অঙ্গ এবং সার্থক গুণী চোরদের যে উপাধিতে ভূষিত করা উচিত সেকথা আমি অনেক দিন ধরেই জোর গলায় দাবী করে এসেছি। তবে কোনদিন ভাবিনি যে নিজে চুরি করব। পাইপ বেয়ে ওঠা—আমার মনে হয়েছে—বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে।

কিন্তু অজিতের ভরসায় এবং আর কোন উপায় না দেখে রাজী হয়ে গেলাম।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি চেয়েছিলাম গভীর রাতে গায়ে তেল মেখে, চোরেরা যেমন করে চুরি করে থাকে, চুরি করতে যাবো। কিন্তু অজিত বোঝালো যে সে সময় ক্যামেরার মালিক ক্যামেরার কাছে কাছেই থাকবে, বরং এই সন্ধ্যাবেলায় তারা নিশ্চয় বেড়াতে গেছে ঘর খালি রেখে, এই সুযোগ।

পথে যেতে যেতে অজিত সরল চুরি শিক্ষা সম্বন্ধে বিদগ্ধ আলোচনা হঠাৎ থামিয়ে বলল—আচ্ছা পাণ্ডবদের সঙ্গে মহাপ্রস্থানে যে কুকুরটা ফলো করছিলো, সেটা কি জাতের ছিল জানিস? অ্যালসেশিয়ান কি? কোথ্থাও স্পষ্ট করে লেখা নেই মাইরি, আমি অনেক খুঁজেছি। যাকগে, ভয় পাস না, মনে হচ্ছে একটা কুকুর আমাদের ফলো করছে।

আমি দেখে নিয়ে বললাম—কুকুর না, হনুমান। আমার চেনা। এক সকালে আমি আপেল খাইয়েছি। আমি হাত নাড়লাম আর হনুমানটা একবার মাথা ঝাঁকিয়ে পাথরের দেয়ালের পিছনে চলে গেল।

হোটেলে পৌঁছে আমি গেট দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, অজিত তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালো, বলল—চোররা অলওয়েজ পাঁচিল টপকায়।

অসম্ভব—আমি জানালাম—আমি পাঁচিল টপকাব না।

অজিত কোন কথা না বলে অনায়াসে পাঁচিল টপকে গেল। কোথা থেকে বেরিয়ে এসে হনুমানটাও ওকে অনুসরণ করল। আমি কোন রকমে ঘষটে পৌঁছলাম যখন ওপাশে, তখন আমার হাঁটু ছড়ে গেছে। অজিত খুবই সান্ত্বনা দিল, কিন্তু ও যখন পাইপ বেয়ে ওঠার প্রস্তাব দিল আমি সবেগে মাথা নাড়লাম। হনুমানটা পাইপ বাওয়াতে সে কিছুই নেই—ব্যথিত হয়ে দু-বার দেখাল।

শেষে আমার প্ল্যানেই অজিতকে রাজী করালাম। প্ল্যান খুব সরল। অজিতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্বাভাবিকভাবে সদর দরজা দিয়ে ঢুকলাম হোটেলে, ম্যানেজারকে একটা জোক বলে হাসিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। সব ঘরই

অন্ধকার। পিতা-পুত্রীর ঘরেও তালা ঝুলছে দেখে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। কিন্তু অজিত তালায় কিছুক্ষণ কান লাগিয়ে শুনে বলল, কিছু না, ছেলেখেলা একটা চুলের কাঁটায় খুলে যাবে। তোর মাথায় চুলের কাঁটা আছে?

না। আমি বললাম।

আবার তালায় কান পেতে বলল,—আমার যন্ত্রের থলিটা থাকলে এক মিনিটের কাজ। যাই হোক, একটা সেফ্‌টিপিন দে।

তখন নীচে গিয়ে ম্যানেজারকে আরেকটা গল্প বলে সেফ্‌টিপিন নিয়ে এলাম।

ঘরে ঢুকে দেখলাম আমাদের আগেই হনুমানটা ঢুকেছে ভিতরে এবং মন দিয়ে ড্রেসিং টেবিলে বসে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে। অজিত আর আমি তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। সম্ভাব্য কোন জায়গাই বাদ রাখিনি। আমাদের দেখাদেখি হনুমানটাও দেরাজ টেনে প্রসাধনদ্রব্য কাগপত্র ছড়াতে লাগলো চারিদিকে।

শেষে অজিতও হাল ছেড়ে দিয়ে বললে—তোর ছবিশুদ্ধ ক্যামেরাটা বোধহয় মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গেই রেখেছে। কোন রুচি জ্ঞান নেই মাইরি।

এই সময় একটা উত্তেতি ক্যাঁচ ম্যাঁচ আওয়াজ শুনে দেখি হনুমানটা একটা অ্যালবাম বের করে মন দিয়ে ছবি দেখছে আর দুষ্টু দুষ্টু তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। অ্যালবাম ভর্তি শুধু চুম্বনরত যুগলের ছবি। মেয়েটি সব ছবিতেই একই। অজিত বললে—ওঃ, প্রতি লোক পিছু এক হাজার টাকা হলে, আবার ট্যাকস-ফ্রি, আর ভাবতে পারছি না।

কিন্তু অ্যালবামে আমার ছবি নেই। আরেকটা অ্যালবামে দেখা গেল শুধু হনুমানের ছবি। অজিত সেটাও পুরোটা দেখতে চাইছিল আমার ছবির খোঁজে কিন্তু ওকে বাধা দিয়ে দুঃখিতভাবে হনুমানটাকে পিঠ চাপড়ে বললাম—অনেক সাহায্য করেছো তুমি। তবে সব তাঁর হাতে। তুমি আমি তুচ্ছ মানুষ কি করতে পারি বল?

হনুমানটাও আমার পিঠ চাপড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঠাস্ করে দরজা খুলে গেল। এবং বাঁদিক থেকে ডানদিকে দেখা গেল সতীশ ভাম্বানি আর তার মেয়ে। নিমেষের মধ্যে অজিত জানলা দিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে গেল, তার এক ইঞ্চি তফাতে হনুমানটা। আমি অসহায় হাসি নিয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম এক পায়ে।

মেয়েটি নিঃশব্দে পর্যবেক্ষণ করল বিধ্বস্ত ঘরটা। আমি আস্তে বললাম—সব, সব গুছিয়ে দেব ঠিকমত। সে এমন অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো যে আমার নাকের ডগা কিছুটা পুড়ে গেল। তারপর ড্রেসিং টেবিলের উপরে প্রসাধনদ্রব্যের ভগ্নাবশেষের দিকে চোখ যেতেই ডুকরে উঠল।

তাড়াতাড়ি বললাম—আমি না, হনুমান।

মেয়েটি গর্জন করল—না, এক হাজারে হবে না, দু'হাজার।

ভাম্বানি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল—ওকে এবার মাপ করে দাও। আমার বন্ধু, তাছাড়া ইঞ্জিনীয়ার, বড় গরীব। না বুঝে করে ফেলেছে, এবার—

মেয়েটির, দেখা গেল, ভীষণ এক দিকে মন। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাহাকার করতে লাগলো—আমার পরচুলার কি দশা করেছে, আমার মাস্কারা, লিপস্টিক! চার হাজার চার হাজার!

আমি আবার আস্তে বললাম—আমি না, হনুমান, হনুমান।

মেয়েটি ফেটে পড়লো—শুনছো, আবার গালাগালি দিচ্ছে? পাঁচ হাজার পাঁচ—আরে! মেয়েটির চোখমুখ মধুর হয়ে উঠল—আরে, কি সুইট হনুমান। দাঁড়াও ছবি তুলে নিই।

আমি পাশে তাকিয়ে দেখি জানলায় আমার বন্ধু হনুমান আমাকে ইসারায় পাইপ বেয়ে নামতে উপদেশ দিচ্ছে।

ওদিকে ক্যামেরা বাগিয়ে মেয়েটি যেই না ফ্ল্যাশ্ বালব্ মেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা তুমুল কোলাহল। হনুমানটা লাফিয়ে তাকে একটা চাঁটি মেরে ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে ঘরের বাইরে অন্ধকার গাছে গাছে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

সেই থেকে অমিতাভ ভয়ে ভয়ে আছি প্রতি রোববার চিড়িয়াখানায় দেখতে যাই সেই হনুমানটা ধরা পড়েছে কিনা। তোকে তাই হনুমান সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞেস করছিলাম।'

—'হনু—'

—'আচ্ছা অমিতাভ, তুই কি জানিস্ হনুমানরা ব্ল্যাকমেল করে কিনা?'

('অমৃত' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

জীবিকা সমাচার — সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
নমস্কার। মাননীয় বেকার বন্ধু ও বান্ধবীর দল - আপনাদের নিষ্কর্মা জীবনে কর্মের হাওয়া বইয়ে দেবার জন্য এই বিভাগ চালু করা হল, বিভিন্ন চাকরী ও ব্যবসার খবর, ছবি সহ এই বিভাগে পাওয়া যাবে,
প্রত্যেক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সামনে জুতো সারাইয়ের দোকান খোলার জন্য লোন দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য দপ্তরে যোগাযোগ করুন,
EMPLOY
উত্তমরূপে জুতায় তাপ্পি লাগাইয়া থাকি,
লরির ড্রাইভারদের কাছ থেকে অট কালেকশনের জন্য পুলিশের হেল্পার নেওয়া হচ্ছে। দপ্তরে যোগাযোগ করুন।
এদিকে হাত যে ব্যাথা হয়ে গেল
এত কমে হবে না।
দেশীয় মদ তৈরী কুটীর শিল্প হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং এই শিল্পে আগ্রহী শিল্পীদের যথাযথ লোন দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দপ্তরে যোগাযোগ করুন। ক্রেতা সাধারণের মনে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য দপ্তর থেকে নমুনা দেওয়া হচ্ছে। সংগ্রহ করুন, পয়সা লাগে না,
ক-কুটির শিল্প·· হিক্·· বা-বাঁচিয়ে রাখা··· হিক্-আমা দের···হিক্·· নৈতিক কর্তব্য
কর্মশিক্ষার শিক্ষক চাই। লেখাপড়া না জানলে চলবে, বিভিন্ন রকম বোমা ইত্যাদি তৈরীর ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা চাই, পাইপগান-ইত্যাদি ঘরোয়া অস্ত্রের ব্যবহার জানা চাই। মস্তানির উপযোগী প্রতিটি শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যক্তি দপ্তরে যোগাযোগ করুন,
এখন তোমাদের বোঝাব- বোমা আর পেটোর তফাত।
পাথর গুঁড়িয়ে কাঁকড় তৈরীর জন্য বিশেষ লোন দেওয়া হচ্ছে। দপ্তরে যোগাযোগ করুন। লোন গ্রহীতারা যে কোন সরকারী টেণ্ডারে অগ্রাধিকার পাবেন, কাঁকড় তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পাথর সরকার থেকেই দেওয়া হবে,
এবারের কাঁকড়টা যা এসেছে না; চাল আর কাঁকড়ে কোন তফাৎ থাকবে না,
CRUSHED STONE FOR EXPORT
FINE RICE IMPORTED

কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া

কোলকাতা ঃ ভোট

জিতলে ঃ 'অবাধ' ; হারলে ওঠে
'রিগিং, রিগিং' আওয়াজ ;
সব দলেরই দেখছি ভোটে—
সর্বাধুনিক রেওয়াজ।

কোলকাতা ঃ বন্‌ধ

'বন্‌ধ সফল'—একদল কন,
অন্যে বলেন ঃ 'ব্যর্থ'।
এক বন্‌ধের মজা কেমন—
দুই রকমের অর্থ!
যা হোক্ সবাই পেরিয়ে এলে
বন্‌ধ অথবা বন্ধন—
সকল দলের সবার মেলে
উষ্ণ অভিনন্দন।

কোলকাতা ঃ জনগণ

জনগণকে বলুন কারা
প্রাণাধিক না ভালোবাসে ?
কেন্দ্র বাড়ায় ট্রেনের ভাড়া,
রাজ্য বাড়ান ট্রামে-বাসে!

কোলকাতা ঃ শ্মশান

বাহকেরা ছোটে সব
উদ্দাম—নৃত্যে ;
লজ্জায় মরে শব—
যেতে শেষকৃত্যে!

কোলকাতা ঃ রাজনীতি

'অন্যায় করে আর
অন্যায় সহে'
আজকের রাজনীতি
তাহাদের ই কহে।

কোলকাতা ঃ আদর্শ

ন্যায়-নীতি সব ভুলি
থাকি মহাসুখে ;
অপরের দোষগুলি
বলি শতমুখে!

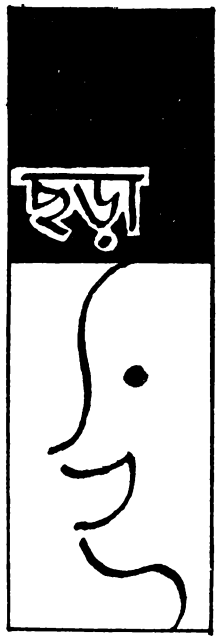

লিমেরিক

দিগম্বর দাশগুপ্ত

পূর্ণিমা আছে, তবু আছে অমাবস্যা
সুখের পিছনে দুখ, বিষম সমস্যা।
বিপরীত দুই নিয়া
চলবেই এ দুনিয়া
হবে না বদল করো যতই তপস্যা!

★

শিক্ষা-দীক্ষা ঘর-বাড়ী সব দেখে শুনে
মেয়ের বিবাহ দিল তেইশে ফাগুনে।
চৈত্রের তেশরাতে
শোনা গেল শেষ রাতে
পণ-বলি হয়ে গেছে মেয়েটি আগুনে!

★

মা-মা-গা-ধা গান সাধে ভাগ্‌নে যাদব
তাই শুনে মাতুলানী বলে, 'বে-আদব!
এই তোর গান সাধা ?
দিস গালি মামা গাধা
যে মামা মেটায় তোর আহ্লাদ সব।"

★

করবে না কো কাউকে বিয়ে এমনি এক তেজিকে
করলো ম্যানেজ অতুল চন্দ্র কি জানি কোন ম্যাজিকে।
যাদুর গুণে বৌটি করে
আনলে ঘরে—, আপন-পরে
বল্‌লে সবাই "কোত্থেকে হায় আনলে এমন বেজি-কে!"

শেখর চ্যাটার্জ্জীর ছড়া

এক

প্রশাসনে গলদ জেনে
বলেন মন্ত্রী মশাই,
"এদের শুধু কাজ হয়েছে
শোওয়া এবং বসাই।
আমলা এবং কেরাণীরা
গোছায় নিজের আখের
ফাইলগুলো সব বাড়ায় শোভা
আলমারী আর তাকের ;
করছি হুকুম
চলবে না ঘুম
কিংবা শোওয়া বসা
সব অফিসে তাই ছেড়েছি
কয়েক কোটি মশা।"

দুই

পৌষ বিকেলে
আর কি খেলে
পায়েস সহ পিঠে
বাতের কামড়
দাঁতের কামড়
ব্যাথা গিটে গিটে।

মধুসূদন পাল

একালের ছেলে

আমাদের দেশে আছে সেই ছেলে কত
সুযোগ পাইলে তারা ভাল ছেলে হতো।
বেকার বসিয়া আছে কোন কাজ নাই
ছিনতাই করে ভাবে, যদি কিছু পাই।
পিঠে ঝোলা চুলগুলো এলোমেলো করা
রোগা ছেলে ফিটফাট চোঙা প্যান্ট পরা।
দাঁড়িয়েই থাকে সে যে বসা বড় দায়
বসতে গেলেই যদি প্যান্ট ফেটে যায়!

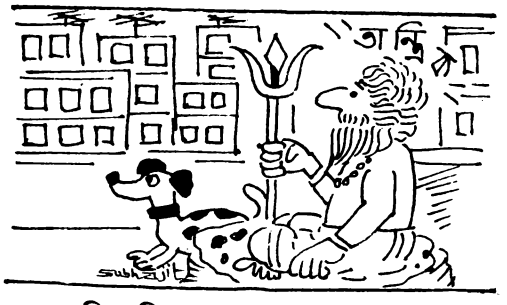

লিমেরিক — **বাসুদেব ঘোষ**

এসেছিল কামরূপ থেকে এক তান্ত্রিক
শহরে ডেরা বেঁধে হয়ে গেল যান্ত্রিক।
মেজাজ ভারি রুক্ষ
মনে বড় দুঃখ,
ভেবে ভেবে অবশেষে ধরে গেল আন্ত্রিক॥

২.

বছর বছর এই দেশেতে আসে আজব ভোট
মন্ত্রী নেতা দেদার ছড়ায় প্রচুর কালো নোট।
আসছে বছর আবার হবে
মাতবে সবাই সে উৎসবে,
এদল, ওদল, সেদল, শুধুই দেখাবে হাইকোর্ট॥

অফিসে কাজ

অফিসটা খোলা থাকে
দশটা-টু-পাঁচটা
কাজ কিছু হয় নাকি
পেতে চান আঁচটা?
দৈবাৎ দেখা পেলে
হেসে কন অফিসার—
'আজ বড় বিজি আমি
আসুন না আরবার'।

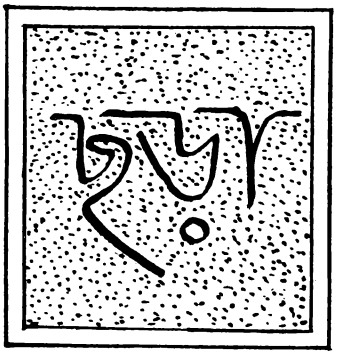

সঞ্জয় কর্মকার

ঘাম বৃত্তান্ত

জিনিষের যদি বাড়ে দাম
সকলেরই ছোটে কালঘাম।
কেন বলেব এমনটা হয়!
চিন্তায় ঘাম বুঝি ঝরে?
বিধুখুড়ো তেতোমুখ করে
বলে—"অনুমান ঠিক নয়।
কাঁচকলা কেনো; নয় পাকা—
যাই কিছু কেনো, জেনো টাকা
খসাতেই হবে কিছু নিতে।
দরদাম বেড়ে নাজেহাল
ঘরে ঘরে বাড়ন্ত চাল
ঘামটাই পাওয়া যায় ফ্রি'তে!"

কলকাতার অলিম্পিক

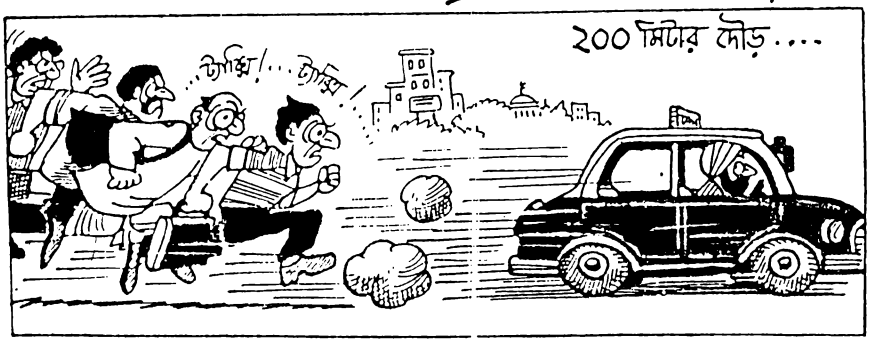

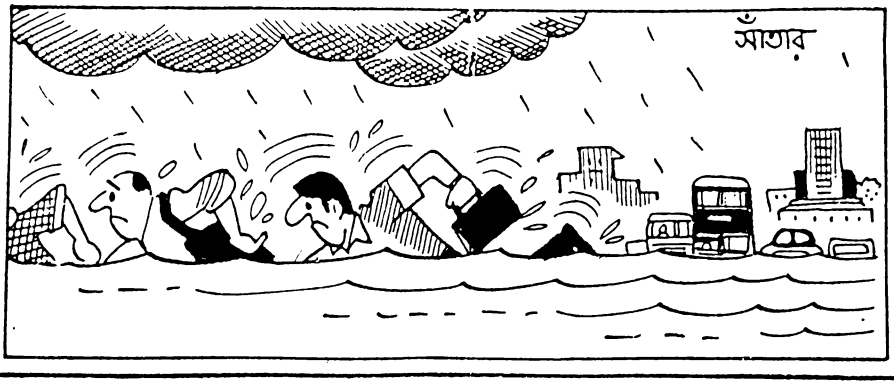

হাই জাম্প
হরাইজন্টাল বার
সিনক্রোনাইজড্ সুইমিং
ওয়েট লিফটিং
ম্যারাথন
OFFICE

('পত্রাঘাত' বিভাগে উত্তর পাবার জন্য সরস চিঠি লিখুন। বুদ্ধিদীপ্ত মজার চিঠি লিখলে সরস উত্তর পাবার সুযোগ থাকে। ব্যক্তিগত বিষয়ে বা লেখা বা আঁকা মনোনীত হলো কিনা তা 'পত্রাঘাত' বিভাগে ছাপা হবে না।

প্রতিমাসে 'পত্রাঘাত' বিভাগের শ্রেষ্ঠ পত্র লেখককে সেই সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠানো হবে।)

রমানাথ দত্ত ঃ হিন্দ সাইকেল রোড, ওরলি, বোম্বাই-৪০০ ০২৫।

মশাই ড্রাগের নেশাও চিকিৎসা করলে ছাড়ে শুনেছি। কিন্তু প্রতি মাসে একটু একটু করে বছরের পর বছর যে হাসির ড্রাগের নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশা নেই। না জানি দেশ জুড়ে কতজন আমার মত Victim-কে এই নেশা ধরিয়েছেন। অথচ পুলিশ এখনও যে কেন আপনাকে ধরছে না তা বোধগম্য হচ্ছে না। সাবধানে থাকবেন।

● আরে করেন কি মশাই! স· কা··র ড্রাগে দেশ জুড়ে এত মাদকাসক্ত গজিয়েছে জানলে Anti Drug Squad কি আমায় আস্ত রাখবে? ড্রাগের নেশায় বুঁদ হয়ে প্রতি মাসে নিয়মিত চার বছর ধরে আপনাদের Drug Supply করে চলেছি অতি সংগোপনে। সেই ড্রাগে আসক্ত হয়েও শেষে দিলেন তো হাটে আমার হাঁড়ি ভেঙ্গে? চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হয় বলেই তো জানতাম। মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা করা কি উচিৎ হচ্ছে আপনার?

(শ্রেষ্ঠ পত্রের জন্য এঁকে এ মাসের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হলো।)

সমর মাজী ঃ চক বরহানপুর, পোঃ চন্দনদহ, দঃ ২৪ পরগনা-৭৪৩ ৫০৩।

লক্ষ্মীট্যারা বিভাগটি আবার চালু করবার জন্য ধন্যবাদ। স্বদেশী বা বিদেশী ধারাবাহিক উপন্যাস চাই এবং কার্টুন আরও বেশী করে দিচ্ছেন না কেন? আশাকরি আগামী সংখ্যায় এ অভাব থাকবে না।

● ট্যারাদের লক্ষ্মীট্যারা ভাল লাগবারই কথা। কিন্তু সিধে চোখ ওয়ালাদের? ওরা তো মশাই চটে যাচ্ছে! তার ওপর আবার ধারাবাহিক উপন্যাস দিতে বলছেন? চেষ্টা করব নাকি? আর কার্টুন বেশী দেওয়া মানে তো লেখার পাতা কমে যাওয়া। তখন আবার শুরু হবে লেখকদের পত্রাঘাত। কোন্‌দিকে যাব মশাই?

অলোক দাশগুপ্ত ঃ ৬৬ বীহাইভ গার্ডেনস্, কলকাতা-৭০০ ০৫৬

এবারের বইমেলার শেষভাগে সরস কার্টুন তো বেশ বাজীমাৎ করেছে বলে মনে হলো। ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢোকাই যাচ্ছিল না। কার্টুনের Collectionটা মন্দ হয়নি।

● ও হরি, ভীড় দেখেই বাজীমাৎ ধরে নিলেন? আপনারা নিজেদের চেনেন না? ৫০% এসেছিলেন স্টলে লাগানো বড় বড় কার্টুনের এগজিবিশন দেখতে (অবশ্যই বিনা প্রবেশ মূল্যে)। ২৫% এসেছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরো বইয়ের কার্টুন আর জোকস পড়ে বইটি রেখে চলে যেতে। ১০% এসেছিলেন ভীড়ের সুযোগে বই হাতাতে (অবশ্যই পয়সা না দিয়ে)। ৫% এসেছিলেন গল্প করতে ও চা খেতে। ৫% এসেছিলেন কমপ্লিমেণ্টারী কপি নিতে। বাকী ৫% এসেছিলেন দু'টাকায় 'সরস কার্টুন' এর পুরনো কপি কিনতে। হিসেব মিললো?

হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী ঃ ৮২৩সি-১, তুলসীপুর, এলাহাবাদ-২১১ ০০৩

সুদূর তীর্থরাজ প্রয়াগ থেকে সাদর অভিবাদন বিদেশী নববর্ষে স্বদেশী অদ্বিতীয় করজোড়ে আপনাকে এবং সরস পাঠক পাঠিকাকূলকে যাঁরা আকুল নয়নে 'সরস কার্টুন' এর প্রতীক্ষায় থাকেন। পত্রিকাটির গুণপনা অন্যান্য পত্রিকা মারফৎ পড়েছি। সুলক্ষণা এমন পত্রিকার গাত্রস্পর্শ করতে চাই।

● দোহাই আপনার। বিক্রি বাড়াবার লোভে ফুচকার জলে ড্রাগ মিশিয়ে খরিদ্দারের নেশা ধরাবার মতন পত্রিকার পাতায় অল্প অল্প হাসির ড্রাগ মেশাচ্ছিলাম। তা রমানাথবাবু দিলেন হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে। নেশাখোরদের নিয়ে এই এক বিপদ মশাই। নেশার ঘোরে কখন যে কি করে বসে তার ঠিক নেই। কাজেই আপনি আর সুদূর প্রবাসে ড্রাগের নেশায় জড়াবেন না। দোহাই আপনার! এর গাত্রস্পর্শ করলেই ড্রাগাসক্তি! বড়ই সংক্রামক মশাই। সাবধান!! এ পর্যন্ত এদের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়েছে এবং নাকি বেড়েই চলেছে বলে শুনছি।

লিলি দাশ ঃ মহামায়া তলা, গড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

নামটা তো লিলি দাশ
থাকি 'বাস' গড়িয়া;
আপনার প্রকাশিত
ছড়াটুন পড়িয়া
হেসে হেসে দম ফেটে
বাড়ী থেকে পড়ি কেটে
চলে যাই কোন্ লোকে
৮০-বি তে চড়িয়া ॥

● নামটাতো লিলি দাশ
জানি চিঠি পড়িয়া।
তারপরে দেখি তিনি
৮০-বি তে চড়িয়া
ছেড়ে তাঁর গড়িয়া
বেঁধেছেন পাকা বাসা
মোর কাঁধে চড়িয়া!!
ছড়া ছেড়ে ছাড়ি ডাক
হয়ে আজ মরিয়া!
বাঁচান আমাকে আজ
ছড়া স্টপ করিয়া ॥

নাম নাম কেবলম্

গোরাচাঁদ চক্রবর্তী

তৎসমদা। নামটা কে রেখেছিল জানি না। তবে তৎকালীন আদ্য মধ্য পাশ করা তৎসমদা যে সংস্কৃতির আদ্যপ্রান্ত গলাধঃকরণ করেছেন তা তাঁর কথা শুনে যে কোন অসাংস্কৃতিক বলে দিতে পারে। নামের প্রতি দুর্বলতা প্রত্যেক মানুষেরই থাকে। কিন্তু তৎসমদার নামটাই যে তাঁর জীবনে নামতা হয়ে দাঁড়াবে, এ ধারণা কারুর ছিল না। থাকলে ওনার নামের সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই এ নাম রাখতেন না। জীবনের উষালগ্ন থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত তৎসমদার তৎসম শব্দ প্রয়োগের সাধ্যাতীত সাধনা সত্যি মনে রাখবার মত।

এহেন তৎসমদার জীবনে ঘোর দুর্দিন নেমে এল বিয়ে করার সময়। বৈবাহিক সূত্র বন্ধনের আগে অর্থাৎ কনে দেখা-দেখির সময় উনি হঠাৎ উপলব্ধি করলেন যে, এক্ষেত্রে উনি প্রাচীন পথ অনুসরণ করবেন। তাই কুলবধূকে কুলে ঠাঁই দেবার যাবতীয় দায়িত্ব উনি কুলপতিদের হাতে তুলে দিলেন। মেয়ে দেখতে গেলেন না। তখন কি আর জানতেন যে, কুলপতিদের দেখা কনে ওনাকে একদিন কোণঠাসা করে দেবে?

বিয়ের পিঁড়িতে বসেই পূর্ববঙ্গীয় পুরোহিতের সাথে বেধে গেল ঝগড়া। কারণটা এমন কিছু নয়, পুরোহিতের উচ্চারণে ওপার বাংলার মাটির গন্ধ তৎসমদার পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। তাই তাঁর প্রতি উচ্চারণের খুঁত বের করতে লাগলেন। পুরোহিত যত বলে—'বাবা আপনে আগে আচমন্ কইর‍্যা দশকর গায়ত্রী জপ্ কইর‍্যলন্।' পশ্চিমবঙ্গীয় তৎসমদা ততো বলতে থাকেন—'পণ্ডিতপ্রবর, আপনার বক্তব্যে কিঞ্চিৎ ভ্রম দৃষ্ট হইয়াছে। আপনি আমাকে এইরূপে উপদেশ বর্ষণ করুন যে—'বৎসে, তুমি প্রথমে আচমন্ করতঃ দশম কর গায়ত্রী জপ্ করিয়া লহ।' অবস্থা যখন চরমে তখন একান্ত আমাকেই দোভাষীর ভূমিকা নিতে হল। এক কথায় বউ ছাড়া তৎসমদার সাথে আমারো বিয়ে হয়ে গেল বলতে পারেন। মেয়েপক্ষের অনেককে আড়ালে বলতে শুনলুম—বরটা আচ্ছা ঠ্যাটাতো।

তৎসমদার বাসরঘর তেমন সুখকর হয়নি। পাড়ার এক বয়স্কা বরকনে দেখে হঠাৎ মুখ ফস্‌কে বলে ফেলেছেন—'বাঃ দুটিতে বেশ মানাইসে।' আর যায় কোথায়? ফট্ করে তৎসমদা বলে বসলেন—'ঠাকুরণ, এ ধরনের উক্তি আপনার মুখে মোটেই সমীচিন বোধ হইতেছে না। আমরা আপনা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। তাহা ব্যতীত এখানে আমা অপেক্ষা প্রভূত বয়ঃকনিষ্ঠ বিরাজমান। অতএব এ ধরনের উক্তি আপনার কণ্ঠে মোটেই শোভা পায় না। ইহা ছাড়াও আপনার বাক্যে কিঞ্চিৎ ভুল দৃষ্ট হয়। বাক্যটি শুদ্ধ তখনই হইবে, যখন আপনি বলিবেন—'বাঃ যুগলে বেশ মানাইয়াছে।' ভদ্রমহিলা কোনক্রমে 'ও' বলে পালিয়ে বাঁচলেন। তৎসমদার শালিরাও কেউ বিশেষ কোন ইয়ারকী করার সাহস পেল না। কে জানে আবার হয়ত কোন ভুল বের করে বসবে।

বিয়েতো হল। কিন্তু বউকে নিয়ে তৎসমদা পড়লেন মহামুস্কিলে। তাঁর অনেকদিনের সাধ ছিল বউকে একটা নতুন নামে ডাকেন। এ নিয়ে আমার সাথেও বিস্তর জল্পনা কল্পনা হল। অনেক বই ঘাঁটলেন। বেশ কয়েকদিন এ নিয়ে বিস্তর পড়াশোনাও করলেন। নতুন নামকরণের নানান অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে আমার মত আকাটকেও বশ করে ফেললেন। ওনার মতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিশেষ মূল্য আছে, আর বউ মানেই অর্ধাঙ্গিনী অর্থাৎ অর্ধঅঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং অর্ধঅঙ্গের নামকরণ যাতা ব্যাপার নয়! যাবতীয় অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরে ফিরেও মনোমত কোন নাম না পেয়ে শেষে ঠিক করলেন, নিজের নামের আধখানা বউকে দেবেন। অর্থাৎ 'তৎসম'র 'তৎ'টা রাখবেন নিজের ভাগে। বাকি 'সম'টা অর্ধাঙ্গিনীর ভাগ্যে। যেহেতু প্রায় সব পুরুষ নামের সাথে একটা 'ঈ' কার দিলে স্ত্রী নাম হয়ে যায়, যেমন তাপস থেকে তাপসী, শ্যামল থেকে শ্যামলী ইত্যাদি, সেহেতু উনিও 'সম'র সাথে একটা 'ী' কার দিয়েই বউয়ের নামকরণ সমাধা করলেন। কিন্তু তাতেও গোল

—বাগানের কাজটা সেরে রান্নাটা একটু দেখো, আমি মিনুকে দেখতে যাচ্ছি।

বাধলো, সম বউদি 'ী' কারের চেয়ে 'ি' কারটাকে বেশী পছন্দ করেন। দূরদর্শী তৎসমদা ভাবলেন, ভবিষ্যৎ বংশধরকে নাম শেখানোর সময় পূর্ণাঙ্গের সঙ্গে অর্ধাঙ্গীর খিটিমিটি বাঁধবেই। কারণ 'সমি' শব্দের 'হ্রসসই' কারকে ওনার অর্ধাঙ্গী শেখাবে 'রস্‌সই।' কেননা এখনও বউয়ের 'রস্‌সই' আর তৎসমদার 'হ্রসসই' নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বাধে। তাই চিরাচরিত প্রথানুযায়ী 'ওগো', 'হ্যাঁগো' বলেই ডাকা শুরু করলেন।

বিয়ের প্রথম প্রথম প্রায়ই যেতুম তৎসমদার বাড়ী। কিন্তু আমাকে দেখেই পূর্ণাঙ্গ ভার্সেস অর্ধাঙ্গিনীর ঝগড়া বেধে যেত। বউদি যদি বা বললেন—আরে দেবর যে, এতদিন কোথায় ছিলে? ডুমুরের ফুল হইয়া গিইসিলে নাকি?' অমনি তৎসমদা হুংকার ছাড়েন—ওহে অর্বাচীন, শুদ্ধ করিয়া কহ, এখনও ভাষাজ্ঞান হইল না। 'দেবর' নহে, সংস্কৃতে কহে, দ্বিবর', 'গিইসিলে' নহে 'গিয়াছিলে'। বউদি অমনি ফুঁসলিয়ে ওঠে—ক্যান্ কি ভুলডা কইলাম? যা কইসি ঠিক কইসি। তৎসমদা বলে ওঠে,—নহে, নির্ভুল নহে, 'ক্যান' নহে, 'ক্যানো', 'ভুলডা' নহে 'ভুল', 'কইলাম' নহে কহিলাম'। এক কথা দুকথায় তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। উদ্দেশ্যবিহীন আমি-ই যখন ঝগড়ার প্রধান উদ্দেশ্য, তখন অগত্যা বিধেয়দের ফেলে পশ্চাদধাবন করা ছাড়া আমার আর কিই বা করার আছে?

এহেন তৎসমদার সাথে সেদিন বাজারে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। আরে চক্রবর্তী যে, তোমাকে আমি খুঁজিতেছিলাম।

—আমাকে! আমি মনে মনে বেশ ঘাবড়ে যাই।

—বিষম বিপদে পড়িয়াছি।

—তাই এই আপদকে মনে পড়ল বুঝি!

—বল কিহে, তুমি হলে আপদ উদ্ধার। সন্তোষী মায়ের পুংলিঙ্গ। তাইতো আপদ বিপদে তোমার স্মরণ লই।

—তা বিপদটা কি?

—আবার সেই নাম।

—নাম? আমি মনে মনে রাম নাম করি। কার? বউদির বুঝি?

—আরে না না, তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়াছ আমার একটি বংশধরা হইয়াছে, তোমরা যাহাকে কন্যা কহ। তাহার জন্য একটা জুৎসই নামের প্রয়োজন। আচ্ছা 'খ' নামটা তোমার কেমন লাগে?

—খ! আমি শুনে 'থ'। মুখে বলি—তা বেশ। কেমন 'খ' তে 'খই', তারপরে 'খনা', মস্ত বড় জ্যোতিষাণী।

—আরে না না, আমি বলিতেছি আকাশের কথা। 'খ' মানে হইল 'আকাশ'।

—তা এ ব্যাপারে আবার আমায় কেন? মর্তের মানুষ, আকাশের কতটুকুই বা জানি।

—তা বটে, তা বটে, তাহা হইলে তোমার বউদির শরণাপন্ন হই, কি বল? দেখি যদি নক্ষত্রলোকের কোন নাম না জানা নাম আমার কর্ণগোচর হয়। অর্ধাঙ্গিনী যখন, তখন আমার চিন্তা ভাবনার সম্পূর্ণ না হউক অর্ধেক মিল তো হইবেই।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। হঠাৎই একদিন তৎসমদার বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম মেয়ের শেষ পর্যন্ত কি নাম হ'ল জানতে। বৌদি একগাল হেসে বললেন, তোমার দাদার নামটাকেই রেখে একটা আপোষ করেছি। আমাদের মেয়ের নাম রেখেছি—'খেঁদি'!

———

অমিত রায়

বিজ্ঞাপন

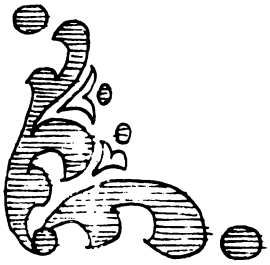

দোটানায় পড়ে মাথাটা অম্লিলেট করছে রিভলভিং টেবিল পাখার মত। হাফ এদিক। হাফ ওদিক।

অফিসে যাচ্ছি একটা শুভ কাজে, তখন মন টনটন করবে কেন? কিন্তু করছে। কেন? কয়েক ফুট দূরে S-এর ভঙ্গিতে এক মোহময়ী দাঁড়িয়ে আছে যে। ঐ মায়াবিনীর দিকে তাকাতেই চোখ ঝলসে উঠছে। উঃ রিঃ বাবা কি চোখ! যেন লেকের টলটলে জল ঐ নয়ন জুড়ে ছলছল কলকল করছে। ওফ্! মনে হচ্ছে দিই এক ড্রাইভ। তাতে প্রাণ থাকে থাক, না থাকে না থাক।

একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে ঐ মায়াবিনী যেই আমার দিকে তাকাচ্ছে, মনে হচ্ছে এক একটা ইরাকি স্কার্ড বুকে এসে বিঁধছে।

তবু তাকে মনের সুখে দেখছি। মহা আনন্দ হচ্ছে। দেখতে দেখতে যেই আবার অফিসের বড় বাবুর গাল তোবড়ানো বদনখানা মনে পড়ছে, তখন উল্টো দিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখতেই হচ্ছে চলন্ত বাসের ঝুলন্ত লীলা।

হঠাৎ চেতনায় এক নাড়া পড়তেই টুপটাপ ঝড়ে পড়তে লাগল 'ব্যক্তিত্ব', 'আত্মসম্মান', 'আত্মবিশ্বাস', ব্যাস। সুইচ অফ্। নো এদিক ওদিক। পার্শ্বদোলন বন্ধ। মাইকের মত একদিকে মুখ করে তাকিয়ে মনের সবটা নিয়ে যাচ্ছি বাসের দিকে। মনে মনে আওড়াচ্ছি আঙ্গুর ফল তেতো। টেরিফিক তেতো।

নিজেকে যখন মোটামুটি নিরেট করে ফেলেছি তখন পিছন থেকে কাঁধে ঝপ করে পরল এক চাপড়। আচমকা ঘুরে তাকাতেই চমকে উঠি।

—কিরে তুই?

আমার বন্ধু সায়ন। এই রঙ্গমঞ্চের তৃতীয় চরিত্র।

—চল তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

—কার সঙ্গে?

—ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সুইট হার্ট।

—কি?

সায়নের কথায় আঁতকে উঠি। যে কিনা কয়েকমাস আগে শুধু ছুঁকছুঁক করত সে এখন ফাটাফাটি ব্যাপার করে বেড়াচ্ছে? কোন বাড়ির মিলি কি ডলি কখন ছাদে কাপড় মেলতে আসবে। কোন জানলার কাছে কোন বৌদি কখন বেশ বদল করবে, সব লিস্ট করা ছিল ওর।

প্রায় হতাশ হয়ে বলত, নারে কিস্যু করতে পারলাম না। যদি আশ্বাস দিতাম, সে কিরে? কি আবার করবি? ভালো চাকরী করছিস। যথেষ্ট লেখাপড়া করেছিস। কলেজ লাইফে মেয়ে পেলেই চুটিয়ে আড্ডা মেরেছিস। আর কি করবি? অমনি চটে যেত। বলত, দূর, জীবনে প্রেমই সব।

মাঝে মাঝে সায়নের জন্য দুঃখ হত। আঃ হাঃ জীবনে প্রেমের স্বাদই বুঝল না ছেলেটা। রাগও হত। শালা প্রেম ভিখারী। শুধু দাও। প্রেম দাও। সব দাও। শম্পা, চম্পা, রিম্পা। রাবিস।

সায়ন আমাকে টানতে টানতে ওর সুইট হার্টের কাছে নিয়ে এল। ও কি আর জানে, যে ওর সুইট হার্টই একটু আগে আমায় পেণ্ডুলামের মতো দুলিয়েছে। হায়, ফার্স্ট বলেই বোল্ড করে দিলি মা!

সায়ন পরিচয় করাতে চাইলে আমিই থামিয়ে দিই। নিজেই হাতটা বাড়িয়ে বলি,

—আমি আয়ন। আপনি?

—তৃষ্ণা। তৃষ্ণা বসু।

বলতে বলতে হাত বাড়াতে আলতো করে আমরা হাত নাড়লাম। সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করলাম,

—কোথায় যাবেন?

—কি জানি? 'ও' জানে।

মেরেছে। তাহলে 'ও' ফেজে চলে গেছে ওরা?

—চলিরে। কয়েকদিনের মধ্যেই তোর সঙ্গে দেখা করব।

বলেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সির দিকে ওরা তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।

আমিও টুক করে একটা চলন্ত বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়লাম। বাস চলছে। আমি ঝুলছি, দড়িতে ক্লিপ আটকানো জামার মত।

দুই

সায়নের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে মনটা বড় খচ্‌খচ্ করছে। যে কিনা ছিল একটা রিয়েল অপদার্থ, সে এখন অলিম্পিক গোল্ড! বরাবরই আমি সায়নের থেকে এব্যাপারে এগিয়ে ছিলাম। এক কথায় চোস্ত বলতে যা বোঝায়।

প্রথম প্রেমের স্বাদ জেগেছিল যখন স্কুলে পড়ি। বাড়িওয়ালার মেয়ের সঙ্গে। এন্তার কাগজের গুলি ছুঁড়েছি। ঐ সব কোঁচকানো প্রেম পত্রের স্বাদই ছিল আলাদা।

রকের মশলা দেওয়া চিঠিগুলোর ভাষাও ছিল তেমনি। ও লিখত। আমার মনের ছাগল তোমার হৃদয়ের ল্যাম্প পোস্টে বেঁধেছি। আমি উত্তর দিতাম, তোমার লুচির মত মন বহুত নরম। কি তেলতেলে। তোমার চোখ দুটো কি মিষ্টি। যেন দুটো চম্‌চম্।

এভাবে কদ্দিন টেকে? কয়েক মাসের মধ্যেই উপমার

ঠেলাঠেলি কমলো। লাটে উঠল প্রেম।

তারপর অবশ্য বিবাগী হইলি। হবই বা কী করে? ও রকম ছ্যাঁচড়া প্রেমে চোট খেলে কেউ বিবাগী হয় না। শিকারী হয়।

হলামও। নেক্সট্ ট্রাই। যখন কলেজে পড়ি। আমার সহপাঠিনী। বেমালুম প্রেমে পড়ে গেলাম। মেয়েটার মনের দৃঢ়তা ছিল বট গাছের মতো। তাকে কিনা আদর করে চুমু খেতে চাওয়া?

এত রস? দে ঝুলিয়ে একেবারে দশতলা থেকে একতলায়। সত্যি সত্যি সব দিকে ঝুললাম। মনে, প্রাণে সম্মানে।

তাও শিক্ষা হল না। আবার হড়কালাম। এবার একটু কচি দেখে।

মাত্র বি· এস· সি পাশ করেছি। ন্যাচারলি বেকার। কোন কাজ কর্ম্ম নেই। দু'চারটে টিউশনি বাদে। কাজ তো চাই। কি করব? কর প্রেম।

মেয়েটি নিতান্তই বালিকা। ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। আমি তার গৃহ-শিক্ষক। দায়িত্ব পড়ল লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার। আনন্দের কথা। কিন্তু কে বলেছিল বলতে, তুমি আমার মনের আরাম জুলি।

'ছিঃ ছিঃ অয়ন দা। আপনাকে অন্যরকম ভেবেছিলাম। ছিঃ।'

এইরে? ঢোঁড়া সাপও দেখি ফোঁস করে ওঠে। কোথায় ভাবলাম কচি মাথা, চেবানো সহজ। এতো আস্তো ধানি লঙ্কা।

রাগে নিজের গালে কষে একটা জমপেস চড় মারতে ইচ্ছে করছিল। কি রে তুই? যে কিনা তোকে পরীক্ষার আগে পরে কত ভক্তি করে প্রণাম করে, বলতে গেলে এলাইনে সবে হামা দিতে শিখেছে। তুই শ্রদ্ধা তার প্রেমে পড়লি! একটু আটকালো না। বলদ কোথাকার।

তিন তিন বার রং নাম্বার হওয়ার পর আর ভালো লাগে? ডায়াল করার স্পিরিটই নষ্ট হয়ে গেল।

কয়েক বছর ব্রাহ্মচর্য পালন করলাম। মেয়ে দেখলেই মা সরস্বতীর কথা মনে পড়ত। মেয়ে মানেই মা, মা সরস্বতী। পিঠে ইউনিভারসিটির ছাপ পড়ল। ভালো চাকরি পেয়ে

প্রতিষ্ঠিত হলাম। কিন্তু তাতেও বাল্যকালের আপসোসটা গেল না। বর্শিতে একটা জুতসই ভালো মাছ গাঁথতে পারলাম না তো কি করলাম। বস্তা বস্তা বই পড়ে রয়ে গেলাম অকম্মের মনুমেন্ট হয়ে।

এ অবস্থায় সায়নের প্রেয়সী দর্শন আমার কাছে রীতিমতো বড় ঘটনা।

তিন

—আরে সায়ন? আয়।

সায়নকে অবাক হয়ে দেখছি। হল কি? বিলিতি জিনস্-সাদা ফ্যানসি জুতো পরে কে এল। সায়ন তো? ঠেস মেরে বললাম,

—ফ্যান্টাসটিক লাগছে। এই তো চাই। কতটা চেঞ্জড্ মনে হচ্ছে জানিস?

—কতটা?

—শুঁয়োপোকা প্রজাপতি হলে যতটা।

—রিয়েলী?

—হুঁ। হিউজ মৌজে আছিস মনে হচ্ছে?

—সত্যি। দারুন কাটছে।

—কাটবে না। মৌচাকের মধুর খোঁজ পেয়েছিস যে। এমন কাফি মোয়া বাগালি কি করে রে?

—এইরকম ভাবে বলিস না। আফটার অল আমার····

—ও সব কেতা রাখত। তোমায় শালা দশ বছর ধরে দেখছি। ভালোই মাপা আছে। হয় কলেজের দু'তিনটে বান্ধবীদের নিয়ে বছরে একটা সিনেমা। নয় শম্পাদের বাড়ী গিয়ে সকলে মিলে হা হা হি হি। এই তো করেছিস।

—চটে যাচ্ছিস কেন? বলছি। তোকে বলতাম না একটা প্রেম করতে হবে?

—ওফ্! প্রেম কখনও করা যায় না। প্রেম হয়; কি প্রেমে পড়ে। গাঁটগুলো তো পেকে লাল হলো। এই ডিফারেন্সটুকু অন্ততঃ বোঝ।

—বুঝে কি হোল। তিন বারই রং নাম্বার করলি।

—প্রেমে কেউ সফল হয়, কেউ ব্যর্থ।

—মানছি। তবে ওসব তত্ত্বে এখন ছ্যাতলা পড়ে গেছে। এখন সব ব্যাপারে নতুন মূল্যবোধ তৈরী হচ্ছে। নতুন ভাবে সব ভাবছে সকলে। প্রেমের মতো ভাইটাল ফিল্ডই বা বাদ যায় কেন?

—তাহলে বলছিস প্রেমে পড়ার বদলে পাবলিক প্রেম করছে?

—একজাক্টলি। তৃষ্ণার কেসটাই ধর। আমি কি ওর প্রেমে পড়েছি? মোটেই না।

সুমনাকে তোর মনে আছে তো? আমাদের ইয়ারে····

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। বলনা।

—সুমনা একদিন আমাকে বলেছিল, সায়ন প্রেম করবি? ভালো মেয়ে আছে। আমারই ক্লাসমেট।

—রাজি হলি?

—হ্যাঁ। একদিন কথামতো ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে আমাদের দেখা হল। সেদিন আমার সঙ্গে সৈকতও গেছিল। সুমনা পরিচয় করিয়ে দিল তৃষ্ণার সঙ্গে। আশ্চর্য ব্যাপার আমাদের দু'জনেরই দু'জনকে পছন্দ হয়ে গেল।

—হবে না। দু'জনেরই তো ডেলি প্যাসেঞ্জারের মতো অবস্থা। আগে থেকেই রেডি। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ফুকলেই এক লাফে সিট নিতে হবে।

—সুমনা মনে হয় আগে থেকেই তৃষ্ণাকে আমার ব্যাপারে সব বলে রেখেছিল। কি চাকরি করি। কোথায় থাকি সব।

—বলবে না। মেয়েটা আসবে কেন? এটা কি নাটক? তোকে বলেনি, তৃষ্ণা কেমন দেখতে?

—বলেছিল।

—তবে?

—কিন্তু সুমনা আমাকে বলেছিল, তৃষ্ণাকে ক্যাসুয়ালি আনবে। আমার পছন্দ হলে তৃষ্ণাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলবে। অথচ ও যে তৃষ্ণাকে সব আগেই বলেছে তা আমার কাছে চেপে গেছে।

—চাপবে না? নইলে মেয়েটার ওয়েট থাকত?

—তা ঠিক।

—তারপর।

—আমাদের দুজনকে একা একা কথা বলার সুযোগ দিয়ে ওরা একটু দূরে ঘুরতে গেল। আমরা সাধারণ কথা বললাম।

—কি বললি?

—নানা রকম। বাড়িতে কে কে আছে। বাবা কি চাকরি করেন? কোন সালে বি· এস· সি পাশ করেছে। কি সবচেয়ে ভালো লাগে?

—তৃষ্ণা কি কি জিজ্ঞেস করল?

—ঐ। রবীন্দ্র সঙ্গীত পছন্দ করি কিনা? বেড়াতে ভালোবাসি কিনা?

—কি করিস এসব জিজ্ঞেস করেনি?

—না, না, একদম না।

—ফার্দার যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে কিছু বলিস নি?

—হ্যাঁ। চিঠি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ও দিল। তুই বল, আগে থেকে যদি আমার ব্যাপারে নাই জানত তো চট করে চিঠি দিতে রাজী হতো। এমন ধূর বনে গেলাম না।

—আরো বনবি। নিজেকে এত নামাতে লজ্জা করে না?

—লজ্জার কি আছে?

—কি আছে? দুম্ করে প্রেমপত্র চেয়ে বস্‌লি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ব্যক্তিত্ব জুতোর তলায়। একটা মেয়ের চিঠি পেলেই কি বীর হয়ে যাবি? দু'চার দিন বোঝ তারপর তো।

—বুঝতে তো চাইনি। বোঝাতে চেয়েছিলাম।

—তৃষ্ণাকে তুই কত ভালোবাসিস, তাই তো?

—হুঁ।

—কি করে বোঝালি?

—কেন? চুটিয়ে লিখেছি কদিন।

—যথা।

—তোমার দেওয়া বইটা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে তোমার আঙ্গুলে ওল্টানো পাতাগুলোয় এখনও রয়েছে তোমার স্পর্শ। বইটা বুকে ধরে মনে হচ্ছে তোমায় ধরে আছি।

—দূর। এসব তো কবিরা বস্তা বস্তা লিখেছে। নিউ কি ছাড়লি বল।

—আমার দেহ এখানে আর মন তোমার কোলে প্রিয়ে। ও সুইট্, আজ আর ঘুমবো না। ফুটবলের মতো তোমার স্মৃতি কোলে করে বসে থাকব। এটাচি হাতে হাঁটলে মনে হয় তোমার হাত ধরে হাঁটছি। শ্যামা পোকা যেমন টিউব লাইট ঘিরে থাকে। তুমি তেমন করে আমায় ঘিরে রাখোনা ডিয়ার।

—থাক ছ'মাসেই এতো। সত্যিই কি তৃষ্ণা ছ'মাসেই তোর সুইট হার্ট হয়ে গেছে? কবে থেকে এত হিপোক্রিট হলি?

—প্রেম করলে অনেক কিছুই হতে হয়।

—ওঃ! তোর হবে। আয় একটা প্রণাম করি।

আমি নিচু হতেই আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরে সায়ন বলল,

—এবার ঘোরাঘুরি। একেবারে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। একদম এক দুজে কে লিয়ে।

—বুঝেছি। নেক্সট্ বিয়ের প্রস্তাব।

—হ্যাঁ।

—ভালো করেই জানতিস ও রাজি। তবু তোর মনের কথা বললি। নো বুকধরফরানী। নো গলা শোকানো। নো সেকি-নেক। অনেকটা কিছু টেস্ট ম্যাচের ম্যানডেটারি ওভার খেলার মতো। রেজাল্ট কি হবে সবাই জানে তবু খেলতে হবে।

—তৃষ্ণাও ফর্মূলা অনুযায়ী মাথা নীচু করে মুচকি হেসে সম্মতি জানাল।

—ও! এতো দেখছি রীতিমতো সম্বন্ধ করে প্রেম।

—অনেকটা তাই। আগে দেখে শুনে সম্বন্ধ করে বিয়ে হত। এখন দেখে শুনে প্রেম করছে সকলে। তারপর প্রেম করে বিয়ে করছে। আজকাল প্রেম করে বিয়ে না করলে স্ট্যাটাস থাকে না।

—দেখিত, এদিকে কোন এক ভূষি মালের গলায় মালা পরাচ্ছে ওদিকে বুক ফুলিয়ে বলছে লাভ ম্যারেজ। এসব গাড়ল মার্কা কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।

—বেশীর ভাগের কিন্তু জ্বলে না। হিংসা করে। তবে তোর কথায় সম্বন্ধ করে প্রেমে কিন্তু দুকুলই থাকে। ভূষি মালের গলায়ও মালা পরাতে হয়না, দেখে শুনে বেছে মস্তি করে প্রেমও করা যায়। প্রেম বিয়ে দুটোই গুছিয়ে হয়। তাই লোকে আজকাল এটাই ভালো খাচ্ছে।

—বুঝলাম। মাছের মুড়োটাও খাবি অথচ কাঁটাও চেবাবি না। শুধু ঘিলুটাই চুষে চুষে খাবি। ভালো। জীবনে অনেক উঠবি।

—আমায় না হয় শম্পা ছাড়া কেউ পাত্তা দেয়নি। তুইতো কম লড়লি না। মোটামুটি সব অ্যাঙ্গেল থেকেই তো ডাইভ্ দিয়েছিলি। কিন্তু কি হল? ফেল মেরে ফেলুদা হলি। ওসব সখী-সখী আঁতলেমি ছাড়। বল, দেখব?

—কি? প্রেম করার জন্য?

—হ্যাঁ।

—না, থাক্। কষ্ট করে আমার দায়িত্ব তোকে নিতে হবে না।

সায়ন ব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা কার্ড হাতে ধরিয়ে বলল,

—তোকে কিন্তু সোমবার ভোরেই এক্সপেক্ট করব।

—তার মানে বিয়ে?

—ইয়েস্ বস্।

আর কথা বাড়াল না সায়ন। 'সকালে আসিস' বলে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

চার

সকালবেলা থেকে সায়ন-তৃষ্ণার কেসটা মনের মধ্যে বড্ড ক্যাচাল বাঁধাচ্ছে। ভিড় জমাচ্ছে দ্বন্দ্বের আর পাল্টা দ্বন্দ্বের।

অনেক তত্ত্বতত্ত্ব ঠেকিয়ে একটা প্রেম লড়াতে পারলাম না। সায়নদের মত প্রেমের নিউ থিওরি প্রয়োগ করলে ক্ষতি কি' এটাই লাস্ট ট্রাই হোক।

সায়নের মত আমি তো সুমনা কি যমুনার কাছে নিজেকে নামাতে পারব না।

গদগদ হয়ে একটা মেয়ে চাইতে পারব না। সম্মানটা তো রাখতে হবে।

বাঙালী যখন এগোচ্ছে, এগোক। আমি বা পিছিয়ে পড়ি কেন? সায়নের চেয়ে না হয় আরো দু স্টেপ এগোলাম।

মনটাকে গুছিয়ে খবর কাগজের জন্য একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া তৈরী করতে লাগলাম মন দিয়ে।

"প্রেমিকা চাই"

সরকারী চাকুরে (২৪০০) ২৭/৫-৭", সল্ট লেকে নিজের বাড়ী, সুদর্শন, একমাত্র পুত্রের গৌরবর্ণা, সুগঠনা, ২২ অনূর্ধ্বা সুন্দরী ও স্মার্ট প্রেমিকা চাই। বক্স—এ-৮০৮, রূপান্তর, কলিকাতা-১।

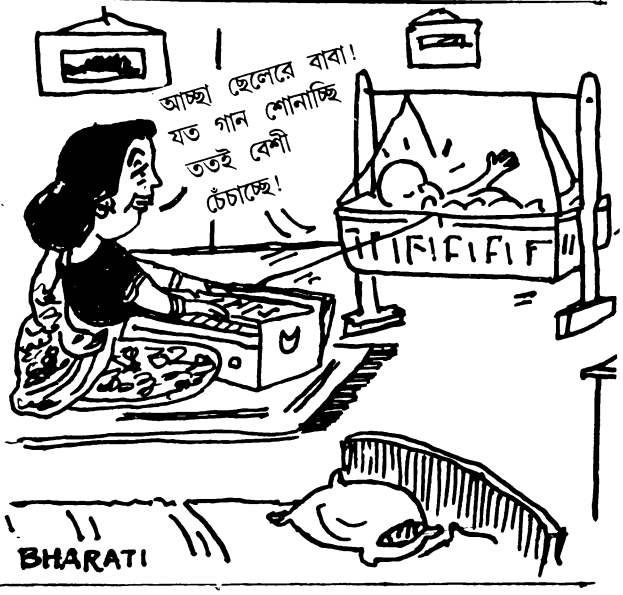

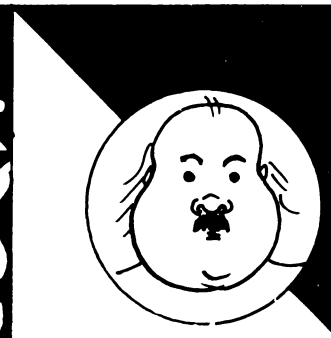

মামা
কাহিনী ও অঙ্কন:
রজত কান্তি সরকার
BUS STOP
বসুন না। সিট তো ফাঁকাই রয়েছে।

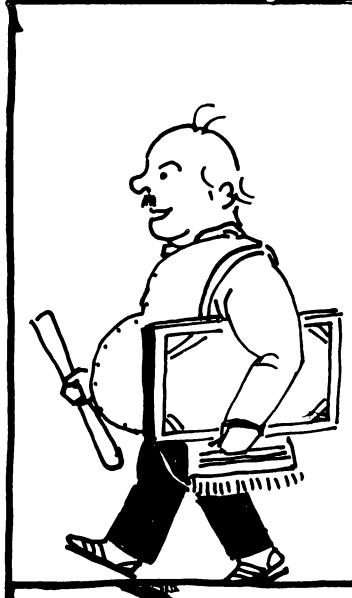

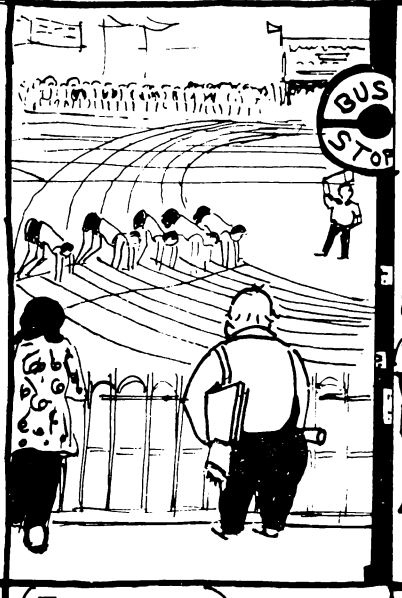

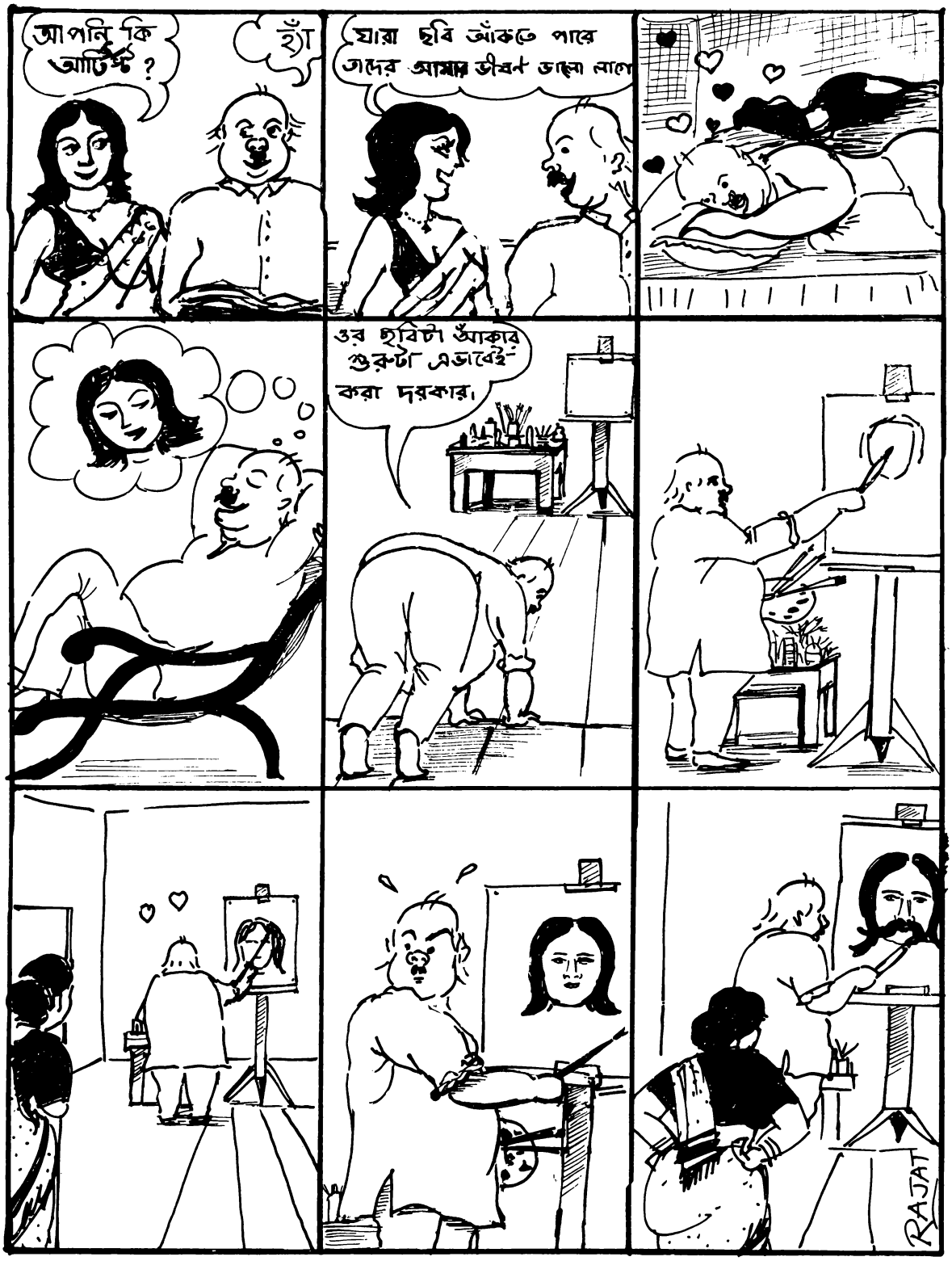
আপনি কি আর্টিস্ট ?
হ্যাঁ
যারা ছবি আঁকতে পারে তাদের আমার জীবন ভালো লাগে
ওর ছবিটা আঁকার শুরুটা এভাবেই করা দরকার।
RAJAT

হাসিচুন

সমর মাজী

১

ভীড় বাস। এক ভদ্রলোক পাশের এক ভদ্রলোকের পায়ের উপর বুটের চাপ দিয়ে দাঁড়িয়ে। বুটের চাপে পিষ্ঠ হওয়া ভদ্রলোক তাকে বললেন, দাদা—

—আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ তো ডান পা টার উপর দাঁড়িয়ে আছেন দয়া করে এবার বাঁ পা টার উপর একটু দাঁড়ান।

২

কলকাতার গড়ের মাঠে দুই যুবক যুবতী সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে প্রেম করছিল। জনৈক পুলিশ অফিসার এসে বললেন, থানায় চলুন।

যুবকটি পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট বের করে বলল, আমার কাছে আর কিচ্ছু নেই স্যার। দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন।

পুলিশ বললেন, থানায় চলুন দেখা যাবে।

যুবকটি ভয়ে কাকুতি মিনতি করে বলল, ঠিক আছে স্যার, এই ঘড়িটা নিন। আর কক্ষনো এখানে আসবো না স্যার।

অনেক হয়েছে, চলুন থানায়, পুলিশ ধমক দিলেন।

যুবকটি পুলিশের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল, যাঃ কি যে ইয়ারকি করছেন মাইরি। আপনি পুলিশ হতেই পারেন না।

৪

এক ভদ্রলোক ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছেন। একটা গগনচুম্বী প্যাণ্ডেলে ঢুকে দেখলেন দেবী-মঞ্চে দেবীর পরিবর্তে প্রতিমার দুইটি পা শোভা পাচ্ছে। ভদ্রলোক পূজা কমিটির এক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দাদা আপনাদের দেবীর পরিবর্তে শুধু দুটি পা দেখতে পাচ্ছি। দেহের বাকি অংশটা মানে---

কর্মকর্তাটি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, মাকালী কি পাড়ার পুঁটি যে তার মুখ দেখতে হবে। দেবীর শ্রীচরণ দর্শন করতে হয়। তাই পা দুটি রাখা আছে। তাই পায়ে নমস্কার জানিয়ে চলে যান।

৩

এক প্রেমিককে তার প্রেমিকা বলল, জান তোমার উপর না বাবা খুব খুশি হয়েছেন। বলছিলেন সৌগতের মতো ভদ্র ছেলে এযুগে দেখা যায় না।

প্রেমিকটি সোৎসাহে বলল, তাই না কি ?

প্রেমিকা বলল, হ্যাঁ, তুমি নাকি গতকাল রাস্তায় বাবার পায়ের উপর উপুড় হয়ে প্রণাম করেছো।

মানে—যুবকটি আমতা আমতা করে সলজ্জ হয়ে বলল, আসলে কি হয়েছিল জান, তোমার বাবাকে দেখে ভয়ে পালাতে গিয়ে কলার খোসায় পা পড়ে যায় আর তাতেই তো স্লিপ করে একেবারে তোমার বাবার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

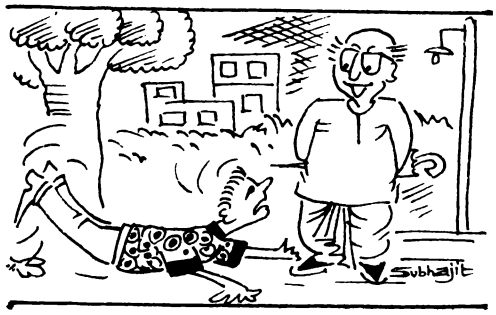

ঝ তে ঝালমুড়ি

ঝালমুড়িতে মরিচ নাই

ঞ ঞতে হয় মিঞা ভাই

চলেন এবার ট-য়ে যাই

ট তে টাকা

যখন তখন টাকা চাইবি?

ঠ তে ঠোয়া

চাইলে পরে ঠোয়া খাইবি

ড তে ডানো

ডানো খাইয়া কমলো ভুড়ি

ঢ তে ঢিলা

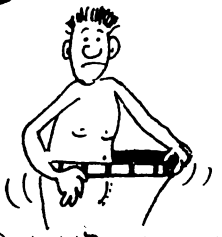

ঢিলা প্যান্ট ক্যামনে পড়ি?

ণ তে মুর্ধণ্য

মূর্ধন্যর দরকার নাই

ত তে তালেব মাস্টার

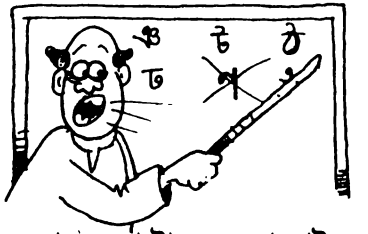

তালেব মাস্টার বললো তাই

থ তে থানা

থানা থেকে দূরে থাকুন

দ তে দারোগা

চোর দেখিলে দারোগা ডাকুন

ধ তে ধোলাই

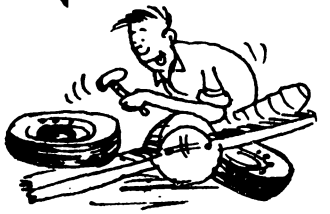

ধোলাই খালে ভাঙ্গে গাড়ি

ন তে নারী

প্রেমে ছ্যাঁকা দেয় যে নারী

SARAS CARTOON REG. NO. RN 48276/90 : MAY 1993 : PRICE : Rs.5.00
POSTAL REG. NO.WB/SC-304

কার্টুন

প্রকাশনীর উপহার

কার্টুনের বিবর্তন ও দুই বাংলার কার্টুন	৩০ টাকা
জোকার্টুন (কার্টুন ও জোকসের কালেকশন)	১৭ "
কার্টুন• কার্টুন• কার্টুন (কার্টুনের কালেকশন)	১৮ "
হাসিটুন (শুধু জোকসের কালেকশন)	১২ "
ছড়াটুন (মজাদার ছড়ার কালেকশন)	১২ "
~~আসুন কার্টুন আঁকি (কার্টুন শেখার বই)~~	~~২০ "~~
~~গিলিপিপা (হাসির গল্পের বই)~~	~~১৫ "~~
সরস কার্টুন পূজা সংখ্যা ১৯৯২	৩০ "
সরস কার্টুন সেট (পূজা সহ ১০টি সাধারণ সংখ্যা)	৪৫ "
— ঐ — খিচুড়ি সেট (১০টি সাধারণ সংখ্যা)	২৫ "
~~কার্টুন কমিক্স ... ...~~	~~৫ "~~
আসুন কার্টুন আঁকি (দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)	২৫ "

(ভি.পি তে বই নিতে হলে ১০ টাকা ভি.পি চার্জ অগ্রিম পাঠাবেন)

কার্টুন প্রকাশনী
৬৯-জি সেলিমপুর রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৩১ ফোন: ৪২-৫৭৪৮

একমাত্র স্বত্বাধিকারী সুকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক কেমব্রিজ লেসার প্রিন্ট, এফ-৫৫ দক্ষিনাপণ, গড়িয়াহাট রোড সাউথ, কলিকাতা-৭০০ ০৬৮ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ (ফোন: ৪২-৫৭৪৮) হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক: সুকুমার রায় চৌধুরী।